সমবায়

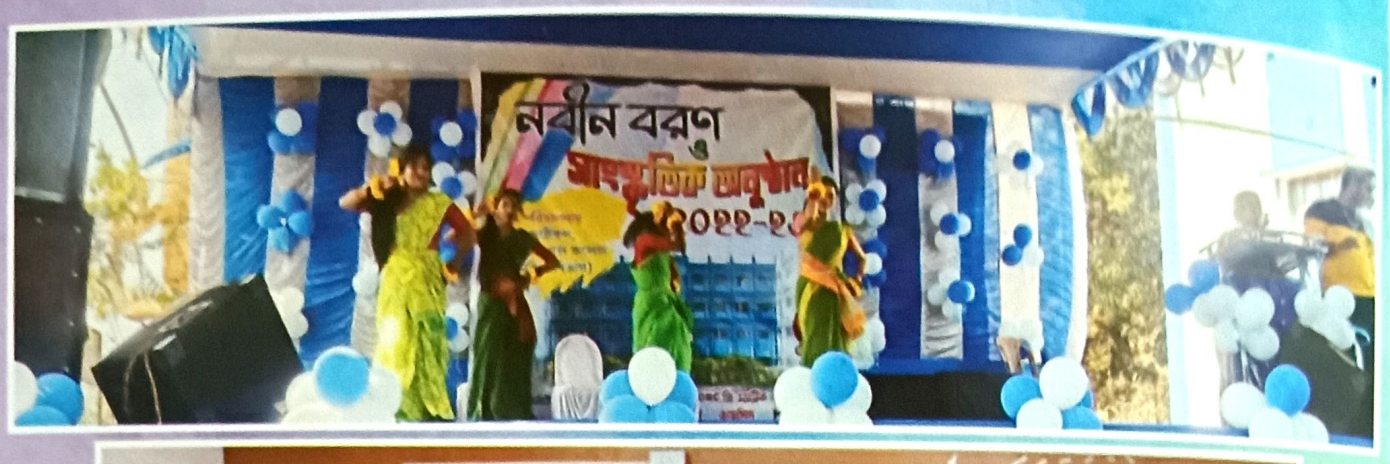
নবীন বরণ

OBSERVATION OF
STUDENTS' WEEK

পিয়াল

বাৎসরিক সংকলন - ২০২৩

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ (মহিলা বিভাগ)

ঝাড়গ্রাম

"আহার কর পরিমিত
ধ্যান কর নিয়মিত
বই পড় মনোযোগ দিয়ে
চিন্তা কর গভীর ভাবে।"

-স্বামী বিবেকানন্দ

"অপ্রিয়স্য চ পথস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ"

- বাল্মীকির রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড

প্রকাশক - ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ (মহিলা বিভাগ)

প্রকাশকাল - ২০২৩

সম্পাদকমণ্ডলী - অমৃতা চক্রবর্তী (সহকারী অধ্যাপক, শারীরবিদ্যা বিভাগ)
শুভাশিস আচার্য (সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ)
ডঃ প্রীতম ঘোষাল (সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ)

অমৃতা সাউ (ইতিহাস বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার)
অনুপমা মাহাত (সংস্কৃত বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার)
কঙ্কনা সিংহদেব (সংস্কৃত বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার)
সুস্মিতা বেরা (সংস্কৃত বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার)

প্রচ্ছদ - প্রেরণা কর

মুদ্রণ - মাধবী জেরক্স এণ্ড অফসেট প্রিন্টিং

Birbaha Hansda
MEMBER
West Bengal Legislative Assembly

Vill. : Vidyasagar Pally
P.O. : Jhargram
P.S. : Jhargram
Dist. : Jhargram
Mob. : 8101683072

Ref. No. JG.M. MLA-02 Date 02/02/23

জঙ্গলমহলের সমাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের পটভূমিতে আত্যন্তিক ও আন্তরিক দায়িত্ব পালন করেছে রাজ কলেজ (মহিলা শাখা)। শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন, বিকাশ ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পরিচয় রেখেছে। এই কাজ সম্ভব হয়েছে রাজ কলেজ (মহিলা শাখা) এর ছত্রছায়ায়, শিক্ষক ও শিক্ষিকাবর্গের সুশৃঙ্খল স্নেহশীল পরিচর্যায়, শিক্ষাকর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতায়।

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম যে ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ (মহিলা শাখা) এর ছাত্রী সংসদের উদ্যোগে বার্ষিক পত্রিকা পিয়াল শীঘ্রই প্রকাশিত হতে চলেছে। আশা করি পত্রিকাটি তার নিজ গুণে সকলের কাছে সমাদৃত হবে।

আমি এই উদ্যোগের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

নমস্কারান্তে

Birbaha Hansda 02/02/23
বিরবাহা হাঁসদা
বিধায়ক, ঝাড়গ্রাম বিধানসভা
পশ্চিমবঙ্গ

Sadhu Ram Chand Murmu University of Jhargram

Jitusol, Jhargram-721514, West Bengal, India

Prof. Amiya Kumar Panda

Vice-Chancellor

Mob: +91 9433347210; Email: vcsrcmuj@gmail.com; Web: www.srcmuj.org; Office: +91 3221 299915

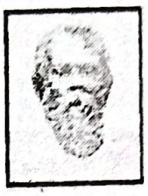

Date: February 03, 2023

Message

I am glad to learn that Jhargram Raj College (Girls' Wing) is bringing out the College Magazine "পিয়াল" during this year.

A magazine always has a great educational value for students as it develops their writing skills and talent. Students also develop their power of thinking and strengthen their imagination. In this way, the general knowledge of students increases and they acquire the habit of reading and writing. In addition to the numerous achievements of the institute this is yet another milestone in their curricular and co-curricular activities.

I hope the magazine will bring the creative talents of the students, faculty members, and alumni of the institute.

I am sure that this magazine will be informative and resourceful.

I convey my good wishes to the Principal, Students, Faculty, and Staff of the college in their endeavors.

With sincere regards,

Amiya Kumar Panda 03/02/2023

Prof. Amiya Kumar Panda
Vice-Chancellor
Sadhu Ram Chand Murmu University of Jhargram
Jhargram, West Bengal

Sri Susil Kumar Barman
Officer-in-Charge.
Jhargram Raj College (Girls' Wing)

Office of the Principal
Jhargram Raj College
Government of West Bengal
Jhargram 721507, West Bengal
Ph: 03221-255022
jhargramrajcollege@gmail.com

Date: 19th January, 2023

Message

I am elated to note that Jhargram Raj College (Girls' Wing) is going to publish its Annual Magazine "PIYAL".

A college magazine reflects the consolidated efforts of the teachers, students and all stakeholders which could aptly be used for recording events, fond of memories and creative writings. I am sure it will also exhibit the latent talents of the teachers and the students as story tellers, poets, essayists and so on.

I extend my warm wishes to the Principal, Teachers, Students of the Jhargram Raj College (Girls' Wing) to continue the journey on the road of excellence.

Sd/— D. Roy

(Dr. Debnarayan Roy, WBSES)
Principal
Jhargram Raj College

Principal
Jhargram Raj College

To,
The Principal/ Officer-in-Charge,
Jhargram Raj College (Girls' Wing), Jhargram

Ph: 03221-255022; Fax: 03221-258700; email: jhargramrajcollege@gmail.com

অধ্যক্ষের কলমে

অতিমারির ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ (গার্লস্ উইং)-এর 'পিয়াল' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। দেখতে দেখতে কলেজের বয়স আট পেরিয়ে ন'য়ে পড়ল। ছাত্রী-অধ্যাপিকা-অধ্যাপক-শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে আমাদের কলেজ এক যৌথ পরিবার। বিগত বছরগুলিতে কলেজে নিয়মিত পঠনপাঠন ছাড়াও আমরা সবাই মিলে বেশ কিছু কাজ করতে পেরেছি। প্রতবন্ধী ও অসুস্থ ছাত্রীদের সুবিধার জন্য কলেজে লিফ্ট বসেছে। কলেজ মাঠের একটি অংশ ঘিরে সবাই মিলে বাগান তৈরি করেছি। বাগানের মধ্যে গড়ে তোলা হয়েছে 'বিদ্যাসাগর উদ্যান'। বর্ণপরিচয়ের স্রষ্টা, নারীশিক্ষা প্রসারের পুরোধা, বিধবাবিবাহের প্রবর্তক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশততম জন্মদিবসে এই মহাপুরুষের জন্মভিটা বীরসিংহ, কলকাতার বাসস্থান বাদুড়বাগান ও শেষ বয়সের আবাসস্থল কার্মাটাড় থেকে মাটি নিয়ে এসে সেই মাটির ওপর এই উদ্যানে তিনটি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। যুবসংসদ প্রতিযোগিতায় প্রথমবার অংশ নিয়ে আমাদের ছাত্রীরা তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় প্রথম, প্রবন্ধ রচনায় দ্বিতীয় এবং ছদ্ম সংসদ প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। এ আমাদের যৌথ উদ্যোগের জয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মূল্যায়নের জন্য আমরা প্রস্তুতি শুরু করেছি। ঝাড়গ্রাম জেলায় নব প্রতিষ্ঠিত সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয় ২০২১-এর মে মাসে আমাদের কলেজের চতুর্থতলায় পথ চলা শুরু করে। প্রায় দেড় বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয় ও অন্যান্য অধ্যাপক-আধিকারিকদের সহৃদয় সাহচর্য আমাদের পাথেয় হয়ে থাকবে।

ঝাড়গ্রাম এক ভালো লাগার জায়গা। ব্যস্ত নগরীর অপ্রীতিকর কোলাহল এখানে নেই। নেই বিষবাষ্পের মতো গুপ্ত আততায়ী। ঢেউ খেলানো রাঙামাটির গালিচায় সবুজ বনানীর ছায়াময় মায়ালোক সবাইকে এখানে আপন করে নেয়। প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে প্রতিটি ঋতু এখানে ভিন্ন ভিন্ন সাজে আবির্ভূত হয়। ঝাড়গ্রামকে না ভালোবেসে থাকা যায়!

সেদিন কলেজের রাস্তায় এক খাবারের দোকানদার বলছিলেন, "পড়ার মজা এ কলেজ ছাড়া আর কোথায় পাবে!" - এ কথাই যেন সত্যি হয়ে থাকে। নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহযোগিতার বন্ধন অটুট রেখে আমরা এভাবেই এগিয়ে যাব। এ আশাই রাখি।

সম্পাদকীয়

আমাদের চিরচেনা অরণ্যনগরী ঝাড়গ্রামে বসন্ত সমাগত প্রায়। চারপাশে অঢেল সবুজের সমারোহ, কচি ডালে নতুন কিশলয়, প্রস্ফুটিত প্রাণের হিল্লোল। প্রকৃতির এই অপার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধকে সঙ্গী করেই এবছর ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ (মহিলা বিভাগ)-এর পত্রিকা 'পিয়াল' দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হতে চলেছে। উদ্যোগ অবশ্য বহুদিনের, তবু খানিক অযাচিত দেরি হল প্রস্তুতি-পর্বে।

ঝাড়গ্রাম জেলায় আমাদের কলেজ বয়স ও অভিজ্ঞতায় নবীনতম। তাই হয়তো, পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে সময় লেগেছে প্রত্যাশার বেশি। অবাঞ্ছিত ভুল-ত্রুটি-ঘাটতিও রয়ে গেল হয়তো বা! তবু সান্ত্বনা, আগ্রহ-প্রচেষ্টার খামতি ছিল না কোথাও। সমাজের মূল স্রোতের বাইরে যে সমান্তরাল জনগোষ্ঠীর বাস এই অঞ্চলে, তাদের ঘরের মেয়েরাই যখন লজ্জা- দ্বিধা- সংকোচের অন্তরাল সরিয়ে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে পত্রিকা নির্মাণ, অলংকরণ ও প্রকাশে, তখন অবচেতনেই মুঠো ভরে যায় ঋণে। আমাদের স্নেহের ছাত্রীদের চেতন, মনন, সৃজনের যথার্থ প্রতিফলন এই 'পিয়াল'। আশা রাখি, আগামী দিনে আমাদের সকলের দায়িত্বে- সচেতনতায়- আন্তরিকতায় 'পিয়াল' এগিয়ে যাবে আরো দু-দশ কদম। শ্রেষ্ঠত্বের তথাকথিত মানদণ্ড নয়, বরং আমাদের সামগ্রিক উত্তরণের চিত্র-ই হোক 'পিয়াল'-এর মূল উপজীব্য।

ভালোবাসা আমার প্রিয় ছাত্রীদের, তোমরাই এ স্বপ্নের, এ আনন্দের আসল অংশীদার; এ প্রত্যয়ী পথচলার নব্য কাণ্ডারী। পরিশেষে, যাদের কথা আলাদা করে উল্লেখ না করলেই নয়, তাঁরা হলেন এই কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহাশয়, সকল অধ্যাপক- অধ্যাপিকা ও ছাত্রীবৃন্দের অভিভাবকগণ। স্থানাভাবের কারণে যে সকল ছাত্রীদের লেখা এ বছর প্রকাশ করা সম্ভব হল না, তাদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আমাদের 'পিয়াল' এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত প্রত্যেককে আবারো হার্দিক অভিনন্দন-কৃতজ্ঞতা।

আমাদের এই যাত্রাপথ অনায়াস, কুসুমাস্তীর্ণ না হোক, ক্ষতি নেই; অনিঃশেষ হোক। এই সম্মিলিত প্রয়াস নিখুঁত, অনিন্দ্যসুন্দর নাই বা হল, সৎ ও নিখাদ যেন হয়! সমস্ত জরা-ব্যাধি-অসুখের অন্ধকার পেরিয়ে আমাদের এই শুভ ইচ্ছেটুকু যেন নিরাময়ী উপশম বয়ে আনে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে। সকলের সবটুকু ভালো হোক। শুভমস্তু।

Jhargram Raj College (Girls' Wing)

List of faculty

Sl. No.	Name	Designation	Department
1	Susil Kr. Barman	Officer-in-Charge	
2	Pampa Hembram	Asst. Professor,HOD	Bengali
3	Mousumi Patra	Asst. Professor	Bengali
4	Suvasis Acharya	Asst. Professor	Bengali
5	Ayanti Mondal	Asst. Professor,HOD	English
6	Madhumita Biswas	Asst. Professor	English
7	Priyanka Sen	Asst. Professor	English
8	Naznin Mullick	Asst. Professor,HOD	Sanskrit
9	Dr. Pritam Ghosal	Asst. Professor	Sanskrit
10	Deblina Mukherjee	Asst. Professor,HOD	Pol Science
11	Dr. Soumita Choudhury	Asst. Professor,HOD	Philosophy
12	Nibedita Debnath	Asst. Professor	Philosophy
13	Rashmi Beck	Asst. Professor,HOD	History
14	Sonia Mondal	Asst. Professor	History
15	Rahul Saikh	Asst. Professor	History
16	Joheb Islam	Asst. Professor,HOD	Sociology
17	Shamayeeta Ghosh	Asst. Professor	Sociology
18	Dr. Suchandra Ghosh	Asst. Professor	Sociology
19	Dr.Debarati Chakraborty	Asst. Professor	Sociology
20	Smita Chakraborty	Asst. Professor	Sociology
21	Dr. Sreyashi Ghosh	Asst. Professor	Sociology
22	Dr. Sutapa Das	Asst. Professor,HOD	Physiology
23	Amrita Chakraborty	Asst. Professor	Physiology
24	Sanatan Murmu	Asst. Professor,HOD	Zoology
25	Trisha Mondal	Librarian	Library

সূচিপত্র

পদ্য

১. বৃষ্টির নিমন্ত্রণ	– প্রিয়াঙ্কা দে	১৩
২. নাম আমার আলো	– অমৃতা সাউ	১৩
৩. বৃষ্টি ভেজা তোমার পরশে	– কাকলি মাহাত	১৪
৪. কবিতা কেমনধারা !	– পম্পা হেম্ব্রম	১৪
৫. হারিয়ে যাওয়া বন্ধুত্ব	– তুহিনা দে	১৫
৬. কলেজে আসা	– সোমশ্রী দুলে	১৬
৭. মা	– মৌ বায়েন	১৬
৮. আমার পুজো	– ঋতুপর্ণা মাহাত	১৭
৯. ইচ্ছে ডানা	– স্মিতা চক্রবর্তী	১৮
১০. বাজে ভীষণ বাজে	– সনাতন মুর্ম্মু	১৯
১১. কুড়ি বছর আগের ডাইরীর পাতা ঃ নব দিগন্ত	– অয়ন্তী মণ্ডল	২০

গদ্য

১. পিয়াল	– সুস্মিতা ঘোষ	২০
২. মাপকাঠি	– সোমা মাহাত	২১
৩. গাজন মেলা	– রুমা আঢ্য	২৩
৪. স্বাস্থ্যই সম্পদ ঃ সবার জন্য ?	– ড. দেবারতি চক্রবর্তী	২৪
৫. মালিক মুহাম্মদ জায়সীর পদ্মাবত ঃ ইতিহাস ও বিতর্ক	– রাহুল সেখ	২৬
৬. তোমরা আছো বলেই	– অমৃতা চক্রবর্তী	২৯
৭. ডুলুং চলে গল্প বলে	– সুশীলকুমার বর্মন	৩১

বৃষ্টির নিমন্ত্রণ

প্রিয়াঙ্কা দে, বাংলা বিভাগ, ষষ্ঠ সেমেস্টার

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
বৃষ্টি ভেজার ক্ষণ।
আমার শহরে ভিজতে এসো
তোমার নিমন্ত্রণ।
ঝুম বৃষ্টিতে ভিজবে তুমি
ভিজবে তোমার মন।
বৃষ্টির কাছে করবে তুমি
আত্মসমর্পণ।
চোখের বিষাদ মুছে যাবে
দুঃখ যাবে ধুয়ে।
তোমার চোখের পাতা যদি,
বৃষ্টি দেয় গো ছুঁয়ে।

নাম আমার আলো

অমৃতা সাউ, ইতিহাস বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার

পাড়াগাঁয়ের মেয়ে আমি, নাম আমার আলো
দেশ বিদেশে যাই আমি, সবার করি ভালো।
আমি এক ডক্টর,
চেষ্টা করে রোগীদের সুস্থ করি সত্ত্বর।
আমার কাছে কোন রোগই বড় নয়,
রোগীদের আশীর্বাদও কখনোই ছোট নয়।
গ্রামে গঞ্জে মফস্বলে বিনা পয়সাতে
সবাইকে করি সুস্থ সঠিক চিকিৎসাতে।
রোগীদের চিকিৎসা করাই আমার ধর্ম
এটাকে আমি ভালোবাসি, এটাই আমার কর্ম।
ধর্ম ও কর্ম দুই-ই ভালো হলে
মানুষ হওয়া যায়, এটাই সবাই বলে
এই মানুষ-জীবনে কারোর করলে উপকার
ভালো ফল পাওয়া যায়, পরীক্ষিত বারংবার।

বৃষ্টিভেজা তোমার পরশে

কাকলি মাহাত, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, ষষ্ঠ সেমেস্টার

লোকেরা যতই বলুক না পাগলামি!
বৃষ্টিতে আজ ভিজবো তোমার সাথে আমি।

তোমার পাড়ায় শ্রাবণ ধারায় ভিজবো সকাল-সাঁঝ,
মনময়ূরীর কেকা সুরে সুর মেলাবো আজ।

হব অপরূপা; বাঁধবো খোঁপা কুরচি - কদম ফুলে;
নানা অছিলায় দিন কাটাবো ডুলুং - নদীর কূলে।

ঘাসফুলের ওই সুরেলা নূপুর বাঁধবো রাঙা পায়ে,
অনুভূতির দীপমালা আজ মনের আঙিনায়।

তোমার হাতে হাতটি রেখে বসবো পাশে পাশে;
চোখের কাজল যাক না ধুয়ে, তাতে কি যায় আসে!

আজকে হাওয়া ছন্নছাড়া ; জাগুক শিহরণ,
বৃষ্টি ভেজা তোমার পরশে জুড়াবো জীবন।

কবিতা কেমনধারা!

পম্পা হেম্ব্রম, সহকারী অধ্যাপক (বাংলা বিভাগ)

আচ্ছা কবিতা ঠিক কেমন হয়!
শব্দের পর শব্দ জুড়লেই কবিতা!
প্রতিক্ষণে কত যে কথকতা করি,
তা বুঝি কবিতা নয়!
ভাব ভাষা ছন্দ মিলিয়ে বললেই
বুঝি কবিতা হয়! ওই তো
নতুন শিশুটি আধো আধো
এলোমেলো বুলি বলে,
আমি মনে করি, তাই হলো কবিতা।
স্রষ্টার তুলির আঁচড় ধরাতে নিয়ত
যে আঁক আঁকে,তার প্রতি খাঁজে
মোড়া কবিতা,নিঃশ্বাসের প্রতি ভাঁজে
যে ধ্বনি ওঙ্কারিত,তাই হলো কবিতা।
পাখির গান,ঝোরার কুলুকুলু কলতান
প্রিয়মুখ দেখতে চাওয়া আনচান প্রাণ,
তারই মাঝে কবিতার আনাগোনা।
সবপেয়েছির দেশের খোঁজ না পাওয়া
সব হারিয়েও দুঃখ ভুলে স্বপ্ন দেখা
তাই ই তো কবিতা বলে মনে হয়।
তাই বলি,কবিতা আলাদা কিছু নয়,
স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টিই হলো অমর কবিতা।

হারিয়ে যাওয়া বন্ধুত্ব

তুহিনা দে, ইংরেজি বিভাগ, প্রথম সেমেস্টার

যেদিন তুমি এসেছিলে প্রথম আমাদের স্কুলে,
সেদিন আমি ভেবেছিলাম, তুমি কেন যে এখানে এলে!
আমার পরে যেদিন তুমি হলে ক্লাসক্যাপ্টেন,
আমার স্থানে তুমিই তখন করতে ক্লাস মেইনটেন।
প্রথম প্রথম করতাম আমি তোমার ওপর খুব রাগ,
বন্ধু তোমার একটা কথা, কেটে ছিল হৃদয়ে আমার দাগ।
বলে ছিলে তুমি, বন্ধুত্ব ঈশ্বরের দান,
বন্ধুই হলো প্রাণ,
বন্ধুত্বকে কোরো না অপমান।
তারপর যেদিন ব্যথায় চোট পেয়ে কেঁদে উঠেছিলাম আমি,
কেউ পারেনি ভোলাতে বন্ধু, হাসিয়ে ছিলে শুধু তুমি।
সেদিন থেকে হয়ে উঠলে তুমিই আমার প্রিয় সখী,
তোমার সাথে সেই দিনগুলো, খুবই যত্নে সাজিয়ে রাখি।
বাড়ানো হাত ধরেই কাটিয়ে দিলাম বছর খানেক সাত।।
ছিল সবই বন্ধুত্বে, কিন্তু ছিলনা শুধুই বিশ্বাস,
সেসব কথা ভেবে আজও হৃদয় হতাশ।
ওই যে যেদিন ভুল বুঝে তুমি ফিরিয়ে নিলে মুখ,
হারিয়ে ছিলাম আমি তোমার বন্ধুত্বের সেই সুখ।
শোনোনি তুমি আমার কথা, করোনি তো বিশ্বাস
সে ভুল ঠিক বুঝবে তুমি একদিন-এ আমার বিশ্বাস।
যখন হাজার হাজার তারার মাঝে হারিয়ে যাবো আমি,
পড়বে মনে আমার কথা, খুঁজবে আমায় তুমি।
আসলে সত্যি এখন তুমিও জানো,
সে তো আমিও জানি বন্ধু।
আমার হাতে আর কিছুই নেই,
দুরত্বটাই তো আজ বিন্দু থেকে সিন্ধু।

কলেজে আসা

সোমশ্রী দুলে, ইংরেজি বিভাগ,
চতুর্থ সেমেস্টার

স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে এখন
কলেজ যাওয়ার মজা,
পুরোনো দিনের স্মৃতি তবু
আজও আছে তাজা।
ম্যাডামরা বকতো খুব
ছিল নজর কড়া,
কান ধরে দাঁড় করাতো
না পারলে পড়া।
কিন্তু এখন বিশাল খুশি
বকুনি নেই তো আর,
মনের মাঝে আনন্দ আজ
অথই পারাবার।
হঠাৎ করে সেই আনন্দে
পড়লো এসে ছাই,
অয়ন্তী ম্যাডামের ক্লাসের শুরুতে
রোজ বকুনি খাই।
বকুনি দিলে মনে হয়
জ্বলন্ত আগুনের লাভা,
ভালোবাসলে উনিই আবার
প্রভাত রবির আভা।
মধুমিতা ম্যাডাম বকুনি দেন কম
বেশি দেন ভালোবাসা,
ওনাদের স্নেহে এসে মনে হয়
ধন্য এই কলেজে আসা।

মা

মৌ বায়েন, ইংরেজি বিভাগ,
ষষ্ঠ সেমেস্টার

মা গো! তুমি স্নেহময়ী জন্ম দিয়েছো মোরে,
দশটি মাস দশটি দিন গর্ভে ধারণ করে।
প্রসববেদনা সহ্য করেছো আমার জন্মক্ষণে,
একটুও মা দুঃখ পাওনি মেয়ে হয়েছে জেনে।
কষ্ট পেতে দেখেছি মা গো তোমায় বারংবার,
মেয়ে জন্মানোর বিদ্রুপ আর সমাজের ধিক্কার।
লালন-পালন, ভরসা দেওয়া সবই তো মা করো,
দুঃসময়ে মেয়ের মনে সাহস তুমি ভরো।
কষ্ট পেলে চেপে রাখো আপন হৃদয়মাঝে,
সুখগুলো সব ভাগ করে নাও সবার সাথে মিশে।
মা গো, তোমার শ্রেষ্ঠ হৃদয়, মহৎ তোমার প্রাণ,
মোর গর্ভেও হয় যেন মা কন্যা সন্তান।

আমার পুজো

ঋতুপর্ণা মাহাত, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চতুর্থ সেমেস্টার

চারিদিকে ফুটেছে কাশফুল
তৈরি হচ্ছে মায়ের শাড়ি, গয়না আর চুল।
বাতাসে যেন ভেসে আসছে পুজোর গন্ধ
কবে পরবো সেই নতুন নতুন জামাগুলো
তারা যে এখনও রয়েছে দোকানে বন্ধ।

গোনা চলছে প্রতিটি দিন
দুঃখগুলো যেন হয়ে আসছে মলিন।
এক একটি দিন কাটছে যেন এক একটি বছর
আর যে সইছে না তর কবে আসবে সেই ভোর
যখন মাকে আর ডাকতে হবে না
নিজেই উঠে যাবো ঘুম থেকে
ছুটবো ফুল তুলতে আর সাথে আনবো বন্ধুদেরও ডেকে।

ঢাক বাজবে, ধুনুচি নাচবে,
নতুন নতুন শাড়ি দিয়ে মায়ের প্রতিমা সাজবে।
মান অভিমান সকল ভুলে, মিশবো সবাই একটি সুরে
ভেঙে যাওয়া স্বপ্নগুলো আবার যাবে জুড়ে।
এক সাথে একসঙ্গে হবে অনেক মজা
দুপুরে বসে খাবো খিচুড়ি আর বেগুন ভাজা।

ষষ্ঠীতে দেখবো পুজো, সপ্তমীতে এখানেই থাকবো
আলতাপাড় শাড়িতে অষ্টমীতে অঞ্জলি দেবো।
নবমীতে মাকে বিদায় দিতে যে হবে এই অঙ্গনে।
মনে মনে দুঃখ হবে, মা গেলে তবেই তো আসবে পরের বছর।
আর যে সইছে না তর; কবে আসবে সেই ভোর।

ইচ্ছে ডানা

স্মিতা চক্রবর্তী, সহকারী অধ্যাপক (সমাজতত্ত্ব বিভাগ)

নবযুগের নবীন তোরা
পাখনা দুটি মেল
মনের ভেতর শঙ্কাগুলো
টুকরো করে ফেল।

সমাজ বলে, মেয়ে হয়েছ
বুঝতে তুমি শেখো,
নিজের মনের কথাগুলো
বন্ধ করে রেখো।

বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি,
যেতে হবে কাল,
একটুখানি মারধোর আর
খেয়ে নিও গাল।

নবজুগের নবীন তোরা
হুঙ্কার দে এক,
রাগ, বিদ্বেষ, মান, অভিমান
করবিনা তুই ত্যাগ।

যুক্তি দিয়ে জবাব দিবি
বলবি মুখের ওপর,
শিক্ষা পেয়ে স্বাধীন হবো
দাঁড়াবো পায়ের উপর।

ভয় করছে? শক্ত খুবই
ভেঙ্গে ফেলা নিয়ম?
তোকে দেখে আরও দুজন
পাবে নতুন জীবন।

ভালোভাবে কন্যাশ্রীর
করিস ব্যবহার,
শিক্ষা তোকে নতুন জীবন
দেবে উপহার।

বাজে ভীষণ বাজে

সনাতন মুর্ম্মু
সহকারী অধ্যাপক (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বাজে বাজে বাজে
ভীষণ লাগছে বাজে
কেন জানো তো, কেন জানো তো
মন যে লাগছে না যে
কিসে? কিসে? কিসে?
কিসে আবার নিজের কাজে।
তাই তো লাগছে বাজে।
সকাল দুপুর সাঁঝে
যখন মন বসাবো ভাবি
তখনি বারোটা বাজে।
বাজে ভীষণ বাজে
ভাবি যখন ধ্যান করবো,
বিশ্বের সকল জ্ঞান ধরবো,
আমার মনের মাঝে,
তখনি বারোটা বাজে।
এইটা বাকি, ওইটা বাকি
কোথাও আমি দেবোনা ফাঁকি;
কিন্তু উপায় আসছে না যে,
তাই তো লাগছে বাজে।
সবই আছে হাতের কাছে
তাও পা খানি আমার থামছে না যে
কাজের লোকের কাজ না হলে
তার কাছে কি আর সাজে?
তাই তো লাগছে বাজে।
গ্রীষ্ম বর্ষা শীতে,
সময় কাটিয়ে নিতে
নানারকম উপায় আছে
হাতের মুঠোর মাঝে।
তাও তো লাগছে বাজে
কি আ-র-র-র করি,
পাহাড়িয়া চলার পথে আটকে গেছি খাঁজে
তাই তো লাগছে বাজে।
হাজার আশা, ভরসা, স্বপ্ন, দুরাশা
লুকিয়ে মনের মাঝে,
তা সে ব্যক্ত হোক না কাজে
কিন্তু হচ্ছে না যে
তাই তো লাগছে বাজে
আহারে কি আরাম
আরাম যে এক ব্যারাম
বসে বসে ভাবছি শুধু
ঝুপড়ি ঘরের "তাজে"।
কিচ্ছুটি আর করছি না
লক্ষ্যে তবু সরছি না
আবার লাগবো কাজে
লাগুক যতই বাজে,
বাজে ভীষণ বাজে।

কুড়ি বছর আগের ডাইরীর পাতা থেকে: নব দিগন্ত

অয়ন্তী মন্ডল, সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজী বিভাগ)

ছড়িয়ে থাকা কিছু মুহূর্তকে একত্রে গুছিয়ে নিয়ে,
ছিঁড়ে যাওয়া তারগুলো বেঁধে,তাতে নতুন সুর দিয়ে-
অতীতের আঁধার রাত ও অশ্রুঝরা দিনগুলো ভুলে,
কয়েক ফোঁটা তরুণ রং ভবিষ্যতের স্বপ্নে গুলে;
এক স্বচ্ছল আগামীর শেষ সীমারেখার দিকে পা বাড়িয়ে
ভালোবাসার মায়ামন্ত্রে মোহিত জগতে হারিয়ে-
নব অরুণের রশ্মিজালের রক্তে ভিজে
চলো যাই এগিয়ে-
নতুন এক দিগন্তের খোঁজে,
যেখানে সবাই ভূষিত অভূতপূর্ব এক প্রেমের সাজে।।

চাঁদের ডাকে সাড়া দেওয়া জোয়ার -ভাটার ন্যায়
উথলে উঠুক জীবনের সব রস,সব অভিপ্রায়।
যে উজ্জ্বল কল্পনা-জগৎ হয়েছে বিধ্বস্ত তিলে তিলে,
মুখরিত করি তাকে আরেকবার বসন্তের নতুন গানে আমরা মিলে;
সব বেদনা সরিয়ে পাগল হাওয়ার তালে তাল মিলিয়ে,
শত বিষাদ মুছে রূপকথার প্রাচীন নৌকোতে পাড়ি দিয়ে-
নব অরুণের রশ্মিজালের রক্তে ভিজে
চলো যাই এগিয়ে-
নতুন এক দিগন্তের খোঁজে,
যেখানে সবাই ভূষিত অভূতপূর্ব এক প্রেমের সাজে।।

পিয়াল

সুস্মিতা ঘোষ, ইংরেজি বিভাগ, চতুর্থ সেমেস্টার

অরণ্যসুন্দরী ঝাড়গ্রাম জেলার শাল-মহুল ঘেরা অরণ্যে তোমার আবির্ভাবের আজ দ্বিতীয় বর্ষ। বীজ-রূপী তুমি আজ দীর্ঘ একবছরের পরিক্রমায় চারাগাছে পরিণত হয়েছো। তোমার আবির্ভাব ঘটেছে ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ (মহিলা বিভাগে)। সেখানে তুমি বেড়ে চলেছো স্বমহিমায়। এই চারাগাছ থেকে তুমি হয়ে ওঠো এক মহীরূহ। তোমার শাখা-প্রশাখার ব্যপ্তি ঘটুক। বিকশিত হয়ে উঠুক তোমার পত্র-পল্লব-মুকুল,ছড়িয়ে যাক দিকে-দিকে। তুমি তোমার কবিতা, গল্প, প্রবন্ধের ডালি মেলে ধরো, প্রতিবছর যোগ করো আরো নব-নব সৃষ্টি। তোমার হাত ধরেই পরিণতি পাক নবাগত লেখনী। শত-শত পাখি তোমার ছত্র-ছায়ায় থেকে ডানা মেলতে শিখুক আকাশে। আর তুমি তাদের এগিয়ে দাও নতুন পথের দিকে। হয়ে ওঠো তুমি তাদের পথপ্রদর্শক। তুমি এভাবেই বাড়িয়ে দাও তোমার হাত ... তোমার এই দ্বিতীয় বর্ষের পূর্তি উপলক্ষ্যে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

মাপকাঠি

সোমা মাহাত, ইংরেজি বিভাগ, প্রথম সেমেস্টার

পড়ন্ত বিকেল। অস্তাচলগামী সূর্যের আলোয় চারিদিকে এক নৈসর্গিক আভা। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা উড়ে চলে তাদের কুলায়। দোতলায় জানালার কাছে বসে উড়ন্ত পাখিদের মুক্ত ডানায় নিজেকে ভাসিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছিল ঝিলিক। নিজের মনে গুনগুন করে গেয়ে ওঠে "মন মোর মেঘের সঙ্গী, উড়ে চলে দিগদিগন্তের পানে"- তখনই ব্যাঘাত পড়ে গানে। মায়ের গলায় শোনা যায়, 'ঝিলিক, আজ পড়তে বসা হবে কি হবে না ? পড়া তো অনেক বাকি-ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি রাতের মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে। তোমার ফিজিক্স টিচারের ফোন এসেছিল। কাল সকালে উনি টেস্ট নেবেন।' মায়ের কথাগুলো যেন শুনেও শুনলো না ঝিলিক। অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'হ্যাঁ যাই'। তার মন তখনও এঁকে চলেছে নানান ছবি, লিখে চলেছে নানান গল্প।

উচ্চমাধ্যমিক পরিক্ষার্থী ঝিলিক। খুবই মেধাবী। নাচ, গান, আবৃত্তি সবেতেই অসাধারণ পারদর্শী। গান করতে খুবই ভালো লাগে ঝিলিকের কিন্তু এখন আর তা করতে পারেনা। বাবা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, পড়াশোনা ছাড়া অন্য কোনো কিছুতে মন না দিতে। তাই আর গান করে না ঝিলিক। তবুও মাঝে মাঝে গুনগুন করে গেয়ে ওঠে মন। এখন ওর একমাত্র লক্ষ্য ভালো রেজাল্ট। বাবা চান ও অনেক বড় ইঞ্জিনিয়ার হোক। বাবা ওকে বোঝান, 'দেখো ঝিলিক, এখন সমাজ মানুষের মনুষ্যত্ব দেখে না। দেখে রেজাল্ট। তাই তুমি যতই ভালো হও না কেন শেষে তোমাকে রেজাল্টের - মাপকাঠিতেই মাপা হবে। তাতে যদি এতটুকুও খামতি থেকে যায় তাহলে সমাজের চোখে তুমি খারাপ প্রতিপন্ন হবে।'

'মাপকাঠি'; মানুষের দোষ-গুণ পরিমাণ করা হয় যারা দ্বারা! আচ্ছা রেজাল্ট দিয়ে একজন মানুষকে সম্পূর্ণ বিচার করা যায় ? নিজের মনেই হিসাব মেলানোর চেষ্টা করে ঝিলিক, কিন্তু পারেনা। কতসব কঠিন গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে সে। কিন্তু এই সমস্যাটির সমাধান খুঁজে পায় না। সেদিন ক্লাসে ঢুকতে একটু দেরি হয়েছে ঝিলিকের। সে ভিতরে ঢুকেই দেখল তার প্রিয় বান্ধবী অপর্ণা আজ ডানদিকের ফার্স্ট বেঞ্চে না বসে বামদিকের শেষ বেঞ্চের কোণায় বসেছে। তার মেজাজ গরম হয়ে গেল। 'অপু তুই পিছনে গিয়ে বসেছিস কেন? সামনে চলে আয়।' অপর্ণা কোনো উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে বসে থাকল। মুখ দেখে মনে হল তার চোখ ভেজা ভেজা। ক্লাসের সেকেন্ড গার্ল সানা। সে ঝিলিকের অপর্ণার প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সে প্রতিবাদের সুরে বলে ওঠে, ' না, অপর্ণা যেখানে বসেছে সেখানেই বসবে। তাছাড়া তোর আর ওর যে প্রতিদিনই ফার্স্ট বেঞ্চে বসতে হবে তার কী কারণ আছে বল ?' ঝিলিকও ছাড়বার পাত্রী নয়। সে ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল, তার দাপটই আলাদা। সে সরাসরি কটাক্ষ করে বলল 'তোরই বা আমাদের ব্যাপারে এত কথা বলার প্রয়োজন কিরে ? ওহ্, আচ্ছা বুঝেছি, তুই অপুকে হিংসা করিস কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, হয়তো অপু তোর থেকে ভালো রেজাল্ট করে না, কিন্তু ওর অনেক গুণ আছে। সেজন্যই সে আমার এত প্রিয়।' কথাগুলো গড়গড় করে বলেই ঝিলিক চলে যায় অপর্ণার কাছে।

পাঠকদের মনে হয়তো প্রশ্ন জেগেছে কে অপর্ণা, ঝিলিকের সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কী ? এবার তাদের সম্পর্কে

কিছু কথা বলা যাক।

ঝিলিক শুধু যে মেধাবী তাই নয়। সম্ভবত বিদ্যালয়ের মধ্যে তার মত এত উন্নতমানের ছাত্রী কমই আছে। অপর্ণা তারই আবিষ্কার। অপর্ণা যখন এই বিদ্যালয়ে এসেছিল সে ছিল 'গ' বিভাগের ছাত্রী। ঝিলিকের সান্নিধ্য এবং বন্ধুত্ব তাকে 'ক' বিভাগে নিয়ে এসেছে। এখন ও বিজ্ঞানের ছাত্রী। একদিন সবাই চলে যাওয়ার পর কাঁধে ব্যাগ নিয়ে নামছিল ঝিলিক। তখনই তার কানে আসে অপূর্ব এক মূর্চ্ছনা। সে এমনিতেই সজাগ প্রকৃতির। গ্রাউণ্ড ফ্লোরের ৬ নম্বর ঘরে উঁকি দেয় সে। সেখানে দেখে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে মাউথ অর্গান বাজাচ্ছে। ঝিলিক যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনই নিঃশব্দে বেরিয়ে যেতে চাইছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে মেয়েটি নেমে এল সুর সাম্রাজ্য থেকে পড়ন্ত বিকেলের নির্মল বাস্তবতায়। কী চোখ! নোয়ানো সেই চোখে কী যে মায়া বুঝতে পারে না ঝিলিক। ঝিলিক বলে, 'তুই খুব সুন্দর বাজাস। কী নাম রে তোর?' নিম্নস্বরে উত্তর আসে 'অপর্না'। তারপর থেকে সে হয় অপু। আর ঝিলিক হয়ে ওঠে অপুর প্রাণসখী। ঝিলিক স্বভাবে চঞ্চল এবং বুদ্ধিমতী। অপু শান্ত এবং পড়াশোনায় খুব ভালো না হলেও খুব খারাপও না। হয়তো এই বিপরীতধর্মী স্বভাবের জন্যই অপুকে এত ভালো লাগে ওর। কিন্তু ওদের এই বন্ধুত্বকে কেউ ভালো চোখে দেখতো না। সানা এই ব্যাপারে ঝিলিকের বাবাকেও জানিয়েছে। ওর বাবা একদিন ওকে ডেকে বলেন, 'দেখো ঝিলিক, অপর্ণা আর তুমি এক নও। তোমার টার্গেট ভালো রেজাল্ট। আর ওর পড়াশোনার অবস্থা তুমি জানো। তাই আমি চাই তুমি ওর সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করো। সঙ্গদোষে খুবই বাজে প্রভাব পড়ে।' 'কিন্তু বাবা রেজাল্টই কি সবকিছু? আর অপু অনেক গুণের অধিকারী। বাবা বলে ওঠেন, 'গুণ কেউ ..... সবাই দেখে রেজাল্ট'। আর কথা বাড়ালো না ঝিলিক। তার কাছে অপুর বন্ধুত্ব সমাজের সব মাপকাঠির ওপরে।

একদিন ঝিলিক ফিরছিল লাইব্রেরি থেকে। হঠাৎ কোথা থেকে দুজন ছেলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝিলিকের ওপর। স্পর্শ করে ঝিলিকের হাত। সারা শরীর কেঁপে ওঠে ঝিলিকের। সে চিৎকার করে ওঠে বাঁচাও, বাঁচাও। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি। সমাজের সব শিক্ষিত রেজাল্টধারী ব্যক্তিরা দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল। যারা সমাজের মাপকাঠিতে উচ্চমানের তারা কেউ এগিয়ে এলো না। হঠাৎ দেখা গেল বছর ষোল সতেরোর একটি মেয়ে ধেয়ে আসছে একটি ইঁট হাতে নিয়ে। মুখে রাগ, ঘৃনামিশ্রিত একটা অনুভূতি। সে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেগুলোর ওপর। রক্ষা পায় ঝিলিক। কিন্তু মেয়েটিকে যে রক্ষা করল ঝিলিককে? মেয়েটি আর কেউ নয়, অপর্ণা। ঝিলিকের অপু। সে কখনো A+ পেয়ে ক্লাস টপ করেনি। সমাজের মাপকাঠিতে সে নিম্নমানের। ঝিলিক অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে তার অপুর দিকে, চোখের কোনে জল। এ কি সেই অপর্ণা! সেই শান্ত সরল অপু যাকে কেউ চড় মারলেও মুখ থেকে একটি শব্দ বের হয় না! আজ সে তাকে বাঁচানোর জন্য কতটা হিংস্র রূপ ধারন করেছে! এইসব ঘটনার মাঝে পুলিশ খবর পেয়ে ঝিলিকের মা-বাবাকে নিয়ে সেখানে পৌঁছোয়। পুলিশ ঝিলিকের মা-বাবাকে জানায়, 'অপর্ণা যদি ঠিক সময়ে খবর না দিত তাহলে হয়তো কিছু একটা খারাপ ঘটনা ঘটে যেতে পারত। তারা অপর্ণাকে সাধুবাদ জানাল তার সাহসিকতার জন্য। ঝিলিক তখনও কাঁদছে। অপর্ণা তার কাছে গেল, শান্ত সরল গলা - 'তুই ঠিক আছিস?' অপর্নাকে জাপটে জড়িয়ে ধরে ঝিলিক। দুজনেই কোন কথা বলে না। ঝিলিকের বাবা অপর্ণার মাথায় স্নেহের হাত রাখেন। তিনি বললেন, 'মা আজ তুমি প্রমাণ করে দিলে রেজাল্ট কোনো মানুষকে মাপার মাপকাঠি নয়। মানবিকতাই সবচেয়ে বড় মাপকাঠি।'

গাজন মেলা

রুমা আঢ্য, সংস্কৃত বিভাগ, চতুর্থ সেমেস্টার

সূচনা :- উৎসব মানব জাতির সম্পদ। আমাদের ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধরণের মানুষ বসবাস করে। নানা ধরণের মানুষের বিভিন্ন ধরণের উৎসব হয়ে থাকে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম 'গাজন মেলা'। এই মেলা সাধারণত চৈত্র সংক্রান্তিতে সাধারণ কৃষিজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে হয়ে থাকে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমভাবে পালিত হয় গাজন মেলা। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখের শেষ পর্যন্ত এই মেলা চলে। গ্রামাঞ্চলে এই মেলা আনন্দের একটি উৎসব। বাংলা বিহার, ওড়িশা প্রভৃতি জেলায় এই উৎসব হয়ে থাকে।

উপকরণঃ- বাঁশ, পতাকা, মাটির কলসি, ধূনাচুর, বেত, পাটের দড়ি, ঢাক, সানাই প্রভৃতি।

আমাদের গ্রামের মেলার বর্ণনা ঃ- আমাদের গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন মেলা (নীলষষ্ঠী) পালিত হয়। দশদিন আগে থেকে প্রস্তুতি চলে। চৈত্র সংক্রান্তির চার-পাঁচ দিন আগে থেকে এই মেলা শুরু হয়। পাঁচ-ছয় জন ভোগতা থাকে। এই পাঁচ-ছয় জনকে পুরোহিত মশাই পরিচালনা করেন।পাঁচ-ছয় জনের পরণে ধুতি, গামছা এবং গলায় উত্তরীর। ভোগতাদের নাম-পাট ভোগতা আলাম ভোগতা, কোটাল ভোগতা ও ন্যাগড়া ভোগতা। এই ভোগতারা সারাদিন না খেয়ে, সন্ধ্যাবেলায় স্নান করে ভিজে কাপড়ে ভোলাবাবাকে স্মরণ করে। নীচে আগুন জ্বেলে পুরোহিত মশাই মন্ত্র উচ্চারণ করেন—

সোনার পাট সোনার খাট
সোনার ভোগতা
ভেটে ভেটুক কপাট
শিবে।।

তারপর শুরু হয় ঝুলন। ঝুলনের শেষে নানান রকম অনুষ্ঠান হয়। এইভাবে চার দিন চলে। শেষদিন সকালবেলা সকলে মিলে জল এনে ভোলাবাবার মাথায় জল ঢেলে নিজের মতো করে ভোলাবাবাকে পুজো দেওয়া হয়। ওই দিন সারারাত চলে মেলা। মহড়া নাচ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। নানান রকম দোকান বসে। এই পুজোতে গ্রামের প্রত্যেকের বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন আসে এবং প্রতিবেশী গ্রামের মানুষ জনও আসে। সকালবেলা সতীঘর পুড়িয়ে, পুজোর রীতিনীতি পালন করে পাঁচদিন সকলে মিলে আনন্দ করে গাজন পর্ব শেষ করা হয়।

জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ

স্বাস্থ্যই সম্পদ: সবার জন্য ?

ড. দেবারতি চক্রবর্তী, সহকারী অধ্যাপক (সমাজতত্ত্ব বিভাগ)

আমরা প্রায়ই বলে থাকি যে স্বাস্থ্যই সম্পদ। কিন্তু এটা কি সবার জন্য প্রযোজ্য? আমাদের দেশের নারীরা কি তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি পুরুষের মতো একই মনোযোগ পায়? স্বাস্থ্যসেবার সুবিধাগুলি 'access' করার ক্ষেত্রেও লিঙ্গবৈষম্য যথেষ্ট। পাশাপাশি মেয়েদের যে চিকিৎসা করা হয় তা জাত, শ্রেণি, ধর্ম এবং প্রতিবন্ধকতার মতো সামাজিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। একটি দেশের মানব উন্নয়ন সূচকের (HDI) প্রধান তিনটি ক্ষেত্র- দীর্ঘ ও স্বাস্থ্যকর জীবন, শিক্ষা এবং একটি শালীন জীবনযাত্রা। শিক্ষার প্রবেশাধিকারের বৈষম্য ছাড়াও নারীর সুস্থ জীবন বজায় রাখার ক্ষেত্রটিও অনেক পিছিয়ে। শুধুমাত্র সুস্বাস্থ্য অর্জন করতে পারলেই শিক্ষার সুফল অর্জন করতে পারবে একজন নারী, এটাও ভুল ধারনা। অল্প বয়সে বিয়ে এবং শিশুর জন্ম দেওয়া ছাড়াও, একজন নারী দৈনন্দিন জীবনে 'অদৃশ্য' বা 'দৃশ্যমান' নানাবিধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যায় এবং বিভিন্ন জায়গায় তা তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া থেকে দূরে রাখে। পুঁজিবাদের সাথে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বিভিন্ন উপায়ে নারীর দেহের নিয়ন্ত্রণ নেয় যা তাকে শারীরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং তার অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। ভোক্তা পুঁজিবাদ প্রায়শই বিভিন্ন পণ্য ও পণ্যের প্রচারের মাধ্যমে নারীর দেহকে নারীত্বের আদর্শ চিত্রের সাথে মেলানোর চেষ্টা করে। ঠিক একইভাবে 'সুস্বাস্থ্যের' নামে পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি নারীর দেহকে 'obese' বা 'skinny' বলে বর্ণনা করে লজ্জা দিয়েছে। মহিলাদের যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য এখনও উদ্বেগের একটি ক্ষেত্র হিসেবে রয়ে গেছে যেখানে মহিলারা কথা বলতে লজ্জা বোধ করেন। নারীর প্রজনন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করাও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ধর্ম। দেহের চিকিৎসায় আরও প্রশ্ন রয়েছে যে কীভাবে মেডিক্যাল ডিসকোর্স শুধুমাত্র মাতৃত্বের চারপাশে নারীত্বকে সংজ্ঞায়িত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মহিলার জীবনকালে শুধুমাত্র গর্ভাবস্থায় যত্ন নেওয়া হয় এবং বাকি সময় তার শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হয়। এইভাবে, মহিলাদের প্রদত্ত প্রায় সমস্ত চিকিৎসা, মনোযোগ তাদের প্রজনন অঙ্গ এবং তাদের প্রজননচক্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ কারণ এটি তাদের সন্তান ধারণের ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত। অনেক ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় নারীদের সংস্থান, শরীরের উপর তাদের স্বায়ত্বশাসন, স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা-গুলিতে অ্যাক্সেসের অধিকারকে উপেক্ষা করার উপর নির্ভর করে। আমরা মেয়েদের শিক্ষা, চাকরির বাজারে অংশগ্রহণ, কর্মক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা, আয়ের অসমতা, গার্হস্থ্য হিংসার কথা বলি কিন্তু তাকে সুস্থ জীবনযাপনের মৌলিক অধিকার না দেওয়াও মানবাধিকারের লঙ্ঘন। একজন নারী তখনই উন্নতি করতে পারে যখন তার শরীর ও মন সুস্থ থাকে। পুরুষশাসিত সমাজে খাদ্য পছন্দ ও অভ্যেসের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নারীর কৈশোর থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত সারাজীবন সঙ্গে থেকে যায়।

পছন্দ এবং অভ্যাসের বৈষম্যমূলক উদাহরণ কৈশোর থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত সারা জীবন থেকে যায়। উপরন্তু জাতি, শ্রেণী, প্রতিবন্ধকতা এবং যৌনতার মতো সামাজিক অবস্থানের সাথে সাথে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিবন্ধী মহিলারা চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইতে গিয়ে আরও বেশি হয়রানির সম্মুখীন হন। অনেক ক্ষেত্রে জোর করে বন্ধ্যাকরণের অভ্যাস রয়েছে যেখানে তাদের প্রজনন স্বায়ত্তশাসন কেড়ে নেওয়া হয়। সাধারণভাবে মহিলাদের জন্য, তাদের সন্তান ধারণ করা বা না করার সিদ্ধান্তগুলি বেশিরভাগ সময়ই স্বামী বা তার বাড়ির লোকের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এটি শুধুমাত্র তাদের শারীরিক স্বায়ত্তশাসনই লঙ্ঘন করে না বরং তাদের মানসিক সুস্থতাও লঙ্ঘন করে। এই শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও আমরা কি বলতে পারি নারীর সম্পূর্ণ ক্ষমতায়ন হয়েছে? তাদের লেখাপড়া থাকলেও তাদের মঙ্গলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা কি তাদের আছে? তারা কি যথেষ্ট সচেতন যাতে তারা নিজের জন্য বিশেষ করে তার যৌনতা এবং প্রজননের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে? এখনই সময় এসেছে আমরা নারীর স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা জনসমক্ষে আনা শুরু করি। তাদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্য এবং মনোযোগ চাওয়া বিলাসিতা নয়, প্রয়োজন। এই সচেতনতার ধারনাটি এখনও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত 'কয়েকজন'-এর হাতে রয়ে গেছে। লিঙ্গ, দারিদ্র্য, সঠিক জ্ঞানের অভাব, অজ্ঞতা ইত্যাদি কারণে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এখনও তাদের পছন্দ প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়। যদিও নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হচ্ছে কিন্তু তাদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং এটিকে অগ্রধিকার দেওয়া প্রায়শই পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পছন্দের দ্বারা নির্ধারিত হয়। 'স্বাস্থ্য-ই সম্পদ : সবার জন্য? এই প্রশ্নটি তাই আজও সমান প্রাসঙ্গিক। স্বাস্থ্য তখনই সম্পদ যখন আমরা এটিকে আমাদের সম্পদে পরিণত করার সুযোগ পাই। এ বিষয়ে তাই বিশদে চিন্তা করা ও শেখার সময় এখন।

মালিক মুহাম্মদ জায়সীর পদ্মাবত ঃ ইতিহাস ও বিতর্ক

রাহুল সেখ, সহকারী অধ্যাপক (ইতিহাস বিভাগ)

মালিক মুহাম্মদ জায়সী পদ্মাবত নামে যে উপাখ্যানটি রচনা করে বিতর্কের সূচনা করেছিলেন তার সমাধান ভারতীয় সাহিত্যে কিছুটা হলেও ইতিহাস এবং লোকসমাজে সেই বিতর্কের অবসান এখনও ঘটেনি। পদ্মাবতীকে নিয়ে ভারতীয় সাহিত্যে অন্যান্য ভাষায় প্রচুর রচনা হলেও আলাউদ্দিন এবং পদ্মাবতীকে নিয়ে প্রথম অবতারণা করেন মালিক মুহাম্মদ জায়সী। একাধিক কাব্যের লেখক জায়সীর দ্বিতীয় কাব্য ছিল পদ্মাবত বা পদ্মাবৎ। পদ্মাবত কাব্য রচনা করেছেন অবধি ভাষায়। পদ্মাবত রচনা সময় জায়সী কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ বা সন উল্লেখ না করার ফলে কোন সময় এটি রচনা হয়েছে তা নিয়ে বতর্ক আছে, তবে বলা যায় যে তার রচনায় শেরশাহের প্রশস্তি থাকায় ধরে নেওয়া হয় যে, এটি রচনাকাল আরম্ভ হয়েছিল মোটামুটি ১৫৪০ সালে। পদ্মিনী আখ্যানের পটভূমি ভারতের ইতিহাসের মধ্যযুগ, আলাউদ্দিন খলজির শাসনকাল (১২৯৬-১৩১৬)। ঘটনার সময়কাল এবং রচনার সময়কাল বিচার করলে সময়ের পার্থক্য প্রায় ১৫০ বছর। মালিক মুহাম্মদ জায়সী ছিলেন একজন ভারতীয় সুফি কবি এবং পীর। কবি নিজেই জানিয়েছেন তিনি সুফি সম্প্রদায়ের চিশতী শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। জয়সী আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে নিজেকে সৈয়দ আশরাফ সিমরান, শেখ মুবারক শাহের শিষ্য বলে বর্ণনা করেছেন। শেষ জীবনে জায়সী আমেঠির রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং বাকি জীবনটা আমেঠিতে কাটান। আখরাওয়াত, আখেরি কালাম, কাহ্নবত ইত্যাদি রচনা করেন। জায়সীকে যে গ্রন্থ খ্যাতি এনে দেয় তা হল পদ্মাবত।

জায়সী পদ্মাবত কাব্য একটি প্রেম কাহিনীমূলক রাজনৈতিক ঘটনার উপাখ্যান। এটি ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি না পেলেও ঐতিহাসিক সাহিত্য গ্রন্থ হিসেবে সাহিত্য ও ইতিহাসে খুব পরিচিত ও বিতর্কিত। ঘটনার পরম্পরা অনুসারে কাব্যগ্রন্থটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমভাগে সিংহলে রাজকন্যা পদ্মাবতীকে লাভ করার জন্য চিতোরের রাজা রত্ন সেনের (রতন সিংহ) সফল অভিযান এবং দ্বিতীয়ার্ধে রানী পদ্মাবতীকে লাভ করার জন্য সুলতান আলাউদ্দিন খলজির ব্যর্থ সামরিক অভিযানের বিবরণ। লোক কাহিনী ও ইতিহাসের ঘটনার মিশ্র পটভূমিতে রচিত এই কাব্যে প্রেম, অভিযাত্রা, যুদ্ধ, সন্ধি, মিলন, বিরহ এবং রোমাঞ্চের সমন্বয়ে রোমান্টিকতার স্পষ্ট রূপ দেখা যায়।

প্রথমপর্বে মোটামুটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে চিতোরের রাজা রত্ন সেন শুকপাখি হীরামনের কাছ থেকে পদ্মাবতীর রূপের বর্ণনা শুনে উৎকন্ঠিত ও ব্যাকুল হয়ে ওঠে যোগীর ছদ্মবেশ ধারণ করে হীরামনকে সঙ্গে নিয়ে সিংহল যাত্রা করেন। এখানে পদ্মাবতীর অনুগত শুকপাখি হীরামনের সাহায্যে রত্ন সেন ও পদ্মাবতীর মিলন পর্ব শুরু হয়। প্রাথমিক বাধাবিপত্তির পর অবশেষে হরগৌরীর বরে পদ্মাবতীকে নিয়ে রত্ন সেন চিতোরে ফিরে আসেন। এদিকে চিতোরে বিরহিণী নাগমতি রাজার কথা ভেবে দুঃখে-দুশ্চিন্তায়

দিন কাটাচ্ছিলেন। এই অংশে নাগমতির একটি বারমাস্যা কাহিনী আছে। প্রথম খন্ডটি শেষ হয় দাম্পত্য জীবনের বর্ণনায়। নাগমতির গর্ভে নাগসেন ও পদ্মাবতীর গর্ভে কমলসেন নামে দুই পুত্র লাভ করেন রত্ন সেন।

দ্বিতীয় অংশের চিতোরের রাজসভায় যক্ষিণী সিদ্ধপণ্ডিত রাঘব চেতন রত্ন সেনের দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে অন্য পণ্ডিতের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হন। মিথ্যা ও সত্যের পরীক্ষায় রাঘবের অপকৌশল ধরা পড়লে রাজা রত্ন সেন তাকে নির্বাসন দণ্ড দিলেন। রাঘব চেতন প্রতিশোধ স্পৃহায় দুরভিসন্ধি মনে গেথে পদ্মাবতীর কঙ্কণ নিয়ে দিল্লিতে পৌঁছলেন। বাদশাহ আলাউদ্দিন পদ্মাবতীর রূপের বর্ণনা শুনে পদ্মিনী লাভের জন্য চিতোর অভিযান করেন। রত্ন সেন পাঠান সৈন্যদের হাতে বন্দি হলে, গোরা এবং বাদল ষোলশো সশস্ত্র সৈন্য রাজা রত্ন সেনকে আলাউদ্দিনের কাছ থেকে ছাড়িয়ে সৈন্যদল চিতোরের উদ্দেশ্য যাত্রা করে। আলাউদ্দিন এদের পশ্চাদ্ধাবন করলে গোরা সৈন্য নিয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, প্রচণ্ড যুদ্ধে গোরা সরজার হাতে নিহত হয়। অন্যদিকে চিতোরের পৌঁছেই রাজা পদ্মাবতীর কাছে দেব সেনের ধৃষ্টতার কথা শুনার পর রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। কুম্ভলমীরের রাজা দেবসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন এবং দেবসেনকে হত্যা করেন। রত্ন সেন আহত অবস্থায় চিতোরের ফিরে আসার পর প্রাণত্যাগ করলে নাগমতি ও পদ্মাবতী আলাউদ্দিনের হাত থেকে রক্ষা পেতে চিতায় আরোহণ করেন। শেষ পর্যন্ত আলাউদ্দিন চিতোর অধিকার করলেন কিন্তু পদ্মাবতীকে লাভ করার বদলে পেলেন কিছু চিতাভস্ম। ব্যর্থতা ও করুণ কাহিনীর মধ্যে জায়সী রচনা শেষ হয়।

পদ্মাবতীর কাহিনী সাহিত্য, লোকসংস্কৃতি এবং লোকসমাজে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত ও স্বীকৃত। আধ্যাত্মিক সাধকের সুন্দর রচনা এবং প্রচলিত সুফিবাদের হাত ধরে কাহিনীর বিস্তার ঘটেছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কবি এবং লেখকদের রচনায় তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন আলাউলের পদ্মাবতী, জেমস্ টডের রচনায় অ্যানালস অ্যাণ্ড অ্যান্টিকুইটিস অব রাজস্থান, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যন' কালিকারঞ্জন কানুনগোর 'পদ্মিনী উপাখ্যন ও তার ঐতিহাসিকতা', নিখিলনাথ রায়ের 'পদ্মাবতী একখানা ঐতিহাসিক কাব্য'। ভারতের জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে তুলে আনার জন্য যে বীরত্ব ও সতীত্বের কাহিনী প্রচার করা হয় তার জন্য যে প্রাচীন ভারতের কাহিনীর আশ্রয় নেয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মালিক মুহাম্মদ জায়সী রচনা পদ্মাবত। এই পদ্মাবত কতখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ বা ঐতিহাসিক সত্য তা নিয়ে প্রবল বিতর্ক আছে।

মধ্যযুগে ভারতের ইতিহাসে আলাউদ্দিন খলজী একজন ঐতিহাসিক চরিত্র। ইতিহাসের সময়কালে আলাউদ্দিনকে বিচার করলে তার চিতোর অধিগ্রহণ প্রমাণ করা কঠিন নয়। মধ্যযুগে রাজ্য জয়, কর আদায়, সন্ধি এবং রাজ্য স্থাপন করতে গিয়ে বিবাহ নীতি স্বীকৃত। কিন্তু মালিক মুহাম্মদ জায়সীর পদ্মাবতী চরিত্র সাহিত্যের

ইতিহাসে রোমাঞ্চ ও রোমান্সের নতুন মাত্রা আনলেও ইতিহাসে প্রবল বির্তকের সৃষ্টি করেছে। সাহিত্যের সাহিত্যিকরা যা সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে, ইতিহাসের ঐতিহাসিকরা ঘটনাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। জায়সীর পদ্মাবত নিয়ে ঐতিহাসিকরা যে প্রশ্নগুলি তুলে ধরেছেন তা হল- দূর সিংহল থেকে এক রাজকন্যা পৌঁছে গেলেন চিতোরের কেল্লায়, একটি পাখির দৌলতে এটা কি সম্ভব ছিল মধ্যযুগে ? আলাউদ্দিনের মতো দুঁদে শাসক এক সুন্দরী নারীর জন্য যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন দিনের পর দিন এটা কি সম্ভব ? ইতিহাস কিন্তু চিতোরের আক্রমণের জন্য অন্য কথা বলে।

আলাউদ্দিনের সমসাময়িক আমির খসরু, যিনি আলাউদ্দিনের চিতোর জয়ের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। তিনি রত্ন সেন, পদ্মিনী, গোরা এবং বাদল কারোর নাম করেননি। সুন্দরী নারীর জন্য যে যুদ্ধ হয়েছিল তার কোন উল্লেখ করেননি। প্রায় সমসাময়িক আর এক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি 'তারিখ -ই-ফিরোজশাহী'তে আলাউদ্দিনের রাজত্বকালের কিছু ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি কোথাও রত্ন সেন এবং পদ্মিনীর নাম উল্লেখ করেননি। আলাওল মূলক আলাউদ্দিনের সময় দিল্লির কোতোয়াল ছিলেন তার কাছ থেকে বারানি পদ্মিনীর নাম শোনেননি।

পদ্মিনীর কাহিনীকে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে অনেকে স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। নিখিলনাথ রায় জায়সীর পদ্মাবত কাব্য এবং তার অবলম্বনে আলাওলের পদ্মাবতী রচনার উপর ভিত্তি করে, পদ্মিনীকে ইতিহাসের স্থান দেবার চেষ্টা করেন। আবার রাজস্থানের ভাটরা এবং লোকসংস্কৃতির গায়করা পদ্মিনীকে জীবন্ত করে তোলেন এবং মধ্যযুগের নায়িকা হিসেবে ইতিহাসের স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা করেন। অন্যদিকে কালিকারঞ্জন কানুনগো মেবারের ইতিহাস, একলিঙ্গ মাহাত্মক গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, রতন সিংহের পিতা সমর সিংহ বিক্রমসম্বাৎ ১৩৫৮ মাঘ মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আলাউদ্দিন ছয়মাস অবরোধ করার পর চিতোর অধিকার করেন। কালিকারঞ্জন যুক্তির মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যদি রতন সিংহ রাজত্ব করে থাকেন তাহলে তা একবছর, এই একবছরের রাজত্বকালে সিংহল যাত্রা, আলাউদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধ, কারাবাস ও মুক্তি যা কোনভাবেই সম্ভব নয়। সামগ্রিক দিক ও তথ্য বিচার করলে পদ্মিনী উপাখ্যানের তথ্য সঠিক নয় তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন ঐতিহাসিক কালিকারঞ্জন কানুনগো। রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় তার 'তর্কে-বিতর্কে ভারতের মধ্যযুগ' গ্রন্থে বলেছেন পাথুরে প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করলে ইতিহাসে পদ্মিনী নেই কিন্তু পদ্মিনীর একটি ইতিহাস আছে। আর বাঙালির তথা ভারতের কাছে পদ্মিনীর আবির্ভাব বিশেষভাবে অর্থবহ। পদ্মিনীর কাহিনী সাহিত্য ও ইতিহাস, লোকসমাজ, লোকসংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিক-তাবাদ এবং সাম্প্রদায়িক ইতিহাসে স্বীকৃত বিষয় হিসাবে পরিগণিত। সাহিত্যের এক ব্যাপক পর্যায়ে পদ্মিনী ও পদ্মাবৎ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবে পরিগণিত। কিন্তু ইতিহাসের কাছে তা এখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি।

তোমরা আছো বলেই ...

অমৃতা চক্রবর্ত্তী, সহকারী অধ্যাপক (শারীরবিদ্যা বিভাগ)

কুয়াশা- ঘেরা ডিসেম্বরের সকাল। শাল-পিয়ালের দেশে পাতাঝরার ভরা মরশুম। ট্রেন থামলো মফস্বলের একটা ছোট্ট প্ল্যাটফর্মে। আগে কখনো আসা হয়নি এখানে; এবার-ই প্রথম। শীতও এবার পড়েছে জব্বর; সোয়েটার-জ্যাকেট-মাফলার চাপিয়েও উত্তুরে হওয়ার দাপট ঠেকানো যাচ্ছে না।

ঝাড়গ্রাম, জীবনের প্রথম কর্মস্থল আমার। কাঁধের ঝোলা ব্যাগে এপয়েন্টমেন্ট লেটার, সঙ্গে আর যা যা কিছু প্রয়োজনীয়। টোটোয় চেপে কলেজের দিকে এগোতে এগোতে টের পেলাম, চাকরিজীবন শুরু করার প্রারম্ভে ঠিক যতটা উত্তেজনা হওয়ার কথা ছিল, ততটা যেন হচ্ছে না। রাস্তায়-ঘাটে, অলিতে-গলিতে, দোকানে- বাজারে, চারপাশের মুখগুলোয় ঝকঝকে সোনা-রোদ খেলে বেড়ালেও আমার মনের মধ্যে চাপা অস্বস্তি, এড়াতে না পারা গুমোটভাব।

আমি কলকাতার মেয়ে নই। জীবনের প্রথম চাকরিস্থল কলকাতাতেই হবে, এমন অসম্ভব প্রত্যাশাও আমার ছিল না। যে কোনো প্রান্তিক শহর বা পাড়াগেঁয়ে অঞ্চলেই পোস্টিং পাবো, এমনটাই ধারণায় ছিল। কিন্তু তা বলে ঝাড়গ্রাম! মাওবাদী অধ্যুষিত জঙ্গলমহল! দুদিন আগে পর্যন্ত যে শহর খবরের শিরোনামে থাকতো রাজনৈতিক অশান্তির কেন্দ্র হিসেবে! সেই ঝাড়গ্রাম! শহুরে আভিজাত্য-আদবকায়দা থেকে যোজন যোজন দূরে থাকা, আর্থ-সামাজিক মানদন্ড বহুলাংশে পিছিয়ে পড়া মানুষের বাসস্থান ঝাড়গ্রাম। অস্বীকার করার উপায় নেই, বাড়ি থেকে এত দূরে এসে ঝাড়গ্রামে নিজের কর্মজীবন শুরু করার মতো মানসিক প্রস্তুতি তখনো গড়ে ওঠেনি। কার্যত একটু হতাশ-ই ছিলাম।

এর পরের ধাপেও সেই হতাশার- ই পুনরাবৃত্তি। ক্লাসে পড়াতে গিয়ে তোমাদের বিস্মিত-বেবাক মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবতাম, কোত্থেকে শুরু করবো! ঠিক কিভাবে বললে বোঝাতে পারবো তোমাদের! কী সেই ভাষা যার হাত ধরে আমিও ছুঁয়ে যেতে পারবো তোমাদের না-জানা, না- চেনা, না- বলা পরিসরগুলো! একটানা এক ঘন্টা ক্লাস শেষ করে পরের দিন পড়াতে গিয়ে বুঝতে পারতাম, ঘাটতি থেকে গেছে অনেকটাই। বিরক্ত হচ্ছিলাম, পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল দ্বিধা, সংশয়, ধৈর্য্যহীনতা। তবু, চেষ্টা করছিলাম সাধ্যমতো বেঞ্চের এপার আর ওপারের মধ্যে সংযোগসেতুটাকে মজবুত করে তৈরী করার। তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে গড়েপিটে নিচ্ছিলাম নিজেকেও।

তিন মাস- ও পেরোয় নি। অরণ্য- নগরী ঝাড়গ্রামে তখন নব ফাল্গুনের কলকল্লোল। কলেজেও বসন্ত বরণের প্রস্তুতি তুঙ্গে। আচম্বিতে এলো ফরমান, স্কুল-কলেজ বন্ধ হবে অবিলম্বে; দেশে কোভিড হানা। এর পরের দু- বছর দেশ জুড়ে লকডাউন; বাধ্যতামূলক অনলাইন আবহ। নতুন সিস্টেমে অভ্যস্ত করা, অভ্যস্ত হয়ে ওঠার চেষ্টা রাতদিন। আর তারপরেও অসহায়ের মতো চেয়ে চেয়ে দেখেছি তোমাদের-ই একের পর এক সহপাঠীর বিয়ে, ক্রমশ এবং ক্রমশ হারিয়ে যাওয়া কেবল। করতাম-ই বা কি! লকডাউনে কর্মহীন, সংসার চালাতে নাজেহাল বাবা যখন মেয়ের বিয়ে দিয়ে বলেন, "ছেলের বাড়ির অবস্থা ভালো। মেয়েকে দুবেলা খেতে দিতে তো পারবে...", তখন এয়ার-কন্ডিশনড ঘরে বসে নিগূঢ় সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণকেও ভীষণ রকম অপ্রয়োজনীয় আর অর্থহীন মনে হয়েছে বারবার। এই দু-বছরের অতিমারী পর্বে পড়াশুনোর কম-বেশি ক্ষতি হওয়ার পরিসংখ্যানটুকু তো আমাদের অনেকেরই জানা। কিন্তু সকলের অগোচরে তোমার-তোমাদের কত শত নিঃশব্দ পরাভব এই ভার্চুয়াল দুনিয়ায়, তার হিসেব রাখা কি আদৌ সম্ভব!

দু-বছরের অনলাইন পর্ব মিটিয়ে যেদিন কলেজ চত্বরে পা রাখলাম, সেদিন-ও বুঝিনি আসল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে এইবার। দীর্ঘদিনের অনভ্যেস-জড়তা ভেঙে নিজেদের দশটা- পাঁচটার রুটিনে অভ্যস্ত হওয়া আর তার সঙ্গে সঙ্গে আলস্য-অনীহা কাটিয়ে তোমাদের কলেজেমুখী করার প্রাথমিক পদক্ষেপটুকুও নেহাত সহজ ছিল না।

তারপর আর পাঁচটা সাদামাটা দৈনন্দিন গল্পে যা হয়... রোজের পড়াশুনো, ক্লাস, সিলেবাস, পরীক্ষা আর তার ফাঁকে ফাঁকে টুকটাক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জাতীয় সেবা প্রকল্পের কাজ। থেমে ছিল না সময়। জীবন ফিরছিলো স্বাভাবিক ছন্দে। যদিও সেই চলা ছিল নিস্তরঙ্গ, আপাতঃ বিশেষত্বহীন। শহর থেকে এত দূরে প্রত্যন্ত একটা সরকারি কলেজে ম্যাজিক ঘটার কোনো কারণ-ও ছিল না আপাতভাবে ।

তবু তো ম্যাজিক ঘটে। পরিবেশবিদ্যার খাতা দেখতে দেখতে চমকে উঠে বলেছি, "এমন মুক্তাক্ষরে এত গুছিয়ে লিখলো কে!" ক্লাসের একেবারে পিছনের বেঞ্চে বসে থাকা দস্যি মেয়েটির সুরেলা প্রচেষ্টায় মুগ্ধ হয়েছি বহুবার। বরাবরের শান্ত-মুখচোরা, সকলের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মেয়েটি যখন নাচের বিভঙ্গে মাতিয়ে দিয়েছে মঞ্চ, নিজের অজান্তেই ভিজে উঠেছে চোখ! স্পোর্টসের মাঠে তোমাদের হাসিমুখ গুলো দেখতে দেখতে আমরা যে কখন কিভাবে আমাদের কৈশোরে-তারুণ্যে পৌঁছে গেছি, নিজেরাও জানি না! আবার তোমরা যখন নিজেদের জীবনের গল্প বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে উঠেছো মাইকের সামনে, স্যার-ম্যাডামরা দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছেন তোমাদের, দেখেছি বহুবার। বাড়িতে এসে বলেছি, "ওদের ভালো হোক!" এইসব ছোট ছোট স্পর্শ, একরত্তি আলাপ-সংলাপ, এই আগলে রাখার চেষ্টা, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ততোধিক সাধারণ যাপনে এ যদি ম্যাজিক না হয়, তবে ম্যাজিক আর কি!

বয়স বেড়ে যায় তারায়, তারায়। দিনে দিনে আমার কর্মক্ষেত্র পুরোনো হয়, কর্মজীবন গুটি গুটি পায়ে গুটিপোকার খোলস ছেড়ে সাবালক হয়ে ওঠে। আমাদের এই অনিত্য স্টাফরুমে-ও একটার পর একটা চেয়ার ফাঁকা হওয়ার সময় এগিয়ে আসে; একটানা বিষাদের সুর বেজে যায় নির্জন দুপুরের কার্নিশ বেয়ে। এই নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে তোমরা-ই এসে হাত ধরো আমার-আমাদের।

যাবতীয় অভাব-অভিযোগ-অনুযোগের উজান বেয়ে তোমরা জ্বেলে রাখো জাদু-চিরাগ। একের পর এক ক্লান্তিকর লড়াই পেরিয়ে তোমরা নিয়ে আসো আশা, আশ্রয়, আশ্বাস। ফুরোতে না চাওয়া নিকষ কালো অন্ধকারের বুক চিরে জেগে ওঠে ভোরের শিশির, তোমরা আছো বলেই। তোমরা রং ভরবে বলে অপেক্ষায় থাকে বিবর্ণ ক্যানভাস, তোমরা ছন্দ মেলাবে বলে জেগে থাকে অফুরান শব্দমালা, তোমরা বলবে বলেই তো গল্পেরা ছড়িয়ে থাকে নিখিল বিশ্বজুড়ে!

বদলির চাকরি; হাজারো উচাটন, অনিশ্চয়তা। আজ এখানে আছি, কাল কোথায় থাকবো, কে জানে! আমাদের এই মধ্যবিত্ত সঞ্চয়ী যাপনের মুঠোয় খুচরো স্মৃতির নুড়ি-পাথরটুকু ছাড়া আর কী-ই বা থেকে যায় শেষমেশ!"তাই, তোমাদের কাছে এসে দুহাত পেতেছি"। আরো আলো, আরো প্রাণ। আরো কথা, আরো গান। এক ও অনন্ত জীবন; পরাগরেণু আজ-ও জাগে তোমরা ছুঁলে।

এই আকালেও স্বপ্ন দেখবো বলে তাই তোমাদের কাছে নতজানু বারবার। তোমরা এসে, হেসে, পাশে দাঁড়াও। ভালো, আরও ভালোবেসে দাঁড়াও। সমস্ত জাগতিক অন্যায়, অবিচার, অসাম্যের কাঁটাতার পেরিয়ে "আয়, আরো বেঁধে বেঁধে থাকি", হাতে হাত রেখে রূপকথা লিখে যাই আগামীর...

ডুলুং চলে গল্প বলে

সুশীলকুমার বর্মন (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)

নদী বয়ে যায়। দিনের পর দিন বছরের পর বছর যুগের পর যুগ সে বয়ে যায়। বয়ে যায় আপন ছন্দে আপন খেয়ালে। যেতে যেতে সে কথা বলে। কথা বলে মাটি-পাথরের সঙ্গে, কথা বলে গাছপালার সঙ্গে, পশুপাখি আর কূলবাসী মানুষের সঙ্গে। সে কতও কথা কতও গল্প কতও কাহিনী। তার চলার শেষ নেই বলারও শেষ নেই। আজ শুনব সে রকমই এক নদীর কথা। নদীর নাম ডুলুং।

আমি ডুলুং। ঝাড়গ্রামেই আমার চলার শুরু ঝাড়গ্রামেই চলার শেষ। ঐ যে তোমরা ঢাঙ্গিকুসুম কাঁকড়াঝোর বেড়াতে যাও, যাওয়ার পথে ওদোলচুয়া, বালিচুয়া, নটাচুয়া, কটুচুয়া, ডুলুংডিহা পার হও, ওখান থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি। ডাইনে বাঁয়ে যে লখাইসিনি, চেরাং, ধ-ডাঙর, ভোরা পাহাড় দেখতে পাও সে সব পাহাড়ের জল চুইয়ে আমার জন্ম। চলা শুরু করে কয়েক পা এগিয়েই পেয়ে গেলাম এক বোন বারেদহ ঝোরাকে। আরও এগিয়ে ধড়সায় ডানদিক থেকে এসে আমার সাথে পা মিলিয়েছে কুপননদ।শাল-মহুয়া-কেঁদ-ধ-ভেলা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মাকড়াপাথরের চাটানের ওপর নাচতে নাচতে আমি পৌঁছে গেছি এক রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে অন্যরাজ্যের সীমানায়। শেষে রোহিণীর কাছে ঝাপিয়ে পড়েছি বড়দি সুবর্ণরেখার বুকে।

আমার দু'কূলে কত রাজা-জমিদারদের প্রাসাদ। কত রাজপুত্র-রাজকন্যে ছিল আমার খেলার সঙ্গী ! রোহিণীর জমিদার ভ্রমরগড়ের রাজপুত্রের অমরপ্রেমের কাহিনী তো তোমরা জানো। রোহিণীর সন্তান রসিকমুরারি কত সাঁতার কেটেছে আমার জলে। পরে তিনিই তো হলেন পরম বৈষ্ণব স্বামী রসিকানন্দ। আর একটা কথা চুপিচুপি বলি শোন। আমার পাড়ে যে কনকদুর্গা মন্দির সেই মন্দিরের ঘাটে এক রাজাকে পাথর চাপা দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। সে রাজার রানি আর্তনাদ করতে করতে স্বামীর চিতায় সহমৃতা হয়েছিলেন। প্রতি অমাবস্যায় রানি এসে ঐ পাথরে মাথা ঠুকে কাঁদেন। রানির সে বুকফাটা কান্না আমিই শুধু শুনতে পাই। সে সব গল্পই আজ শোনাব।

সাঁওতাল, শবর, মুণ্ডা, মাহালি কত আদিবাসী; বাগদি, দণ্ডছত্র, জালিয়া কৈবর্ত্য, ডোম, হাড়ি কত জনজাতি আমার পাড় আলো করে রয়েছে। রয়েছে কুড়মি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, সদগোপ, মাহিষ্য। সবাই আমার সন্তান। আমার জল তাঁদের কাছে গঙ্গাজলের মতো পবিত্র। এই জলেই তাঁদের যত আচার-অনুষ্ঠান, আমার পাড়ে গাছতলায় তাঁদের যত গরাম থান।

এরকমই চলছিল। কোথা থেকে একদিন এসে হাজির হলেন দীর্ঘদেহী সুঠাম চেহারার এক সুদর্শন পুরুষ। তিনি সর্বত্যাগী। ত্যাগ করেছেন পরনের বসনটিও। তাঁর কিছু চাওয়ার নেই। বনের ফলমূল তাঁর খাদ্য, নদীর

জল তাঁর পানীয়। তিনি কাউকে আঘাত করেন না। মশামাছি, পোকামাকড়ের কামড়ে তিনি অবিচল। মানুষ না বুঝে তাঁকে উত্যক্ত করে, তাঁর দিকে পাথর ছুড়ে মারে, তার পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেয়। পাথরের আঘাতে, কুকুরের দংশনে তাঁর গায়ে রক্ত ঝরে। তিনি হাসি মুখে সব সহ্য করেন। মানুষ অবাক হয়। তাদের চেতনা জাগ্রত হয়। এ নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ। সেই মহাপুরুষ বেভাষায় কী বলতে চান, কী বোঝাতে চান, কারো বোধগম্য হয়না। আসলে আভাষে-ইঙ্গিতে তিনি বলতে চান পশুপাখি গাছপালা কাউকে হিংসা করোনা, কাউকে আঘাত করোনা, কাউকে বধ করোনা। সবাইকে ভালোবাস। তবেই ভালো থাকবে।

সেই অনন্ত ধৈর্য্যশীল দিগম্বর সন্ন্যাসী চলে যাওয়ার কিছু কাল পরে এলেন তাঁর ভক্তের দল। বাণিজ্য তাঁদের রক্তে। ঘন জঙ্গলের বনজ সম্পদ নিয়ে তাঁরা শুরু করলেন বাণিজ্য। তাঁদের আসার আগেই আমার কূলবাসীরা খুঁজে পেয়েছিল তামাপাথর। চুল্লির কাঠের আগুনে তামাপাথর গলিয়ে তারা তৈরি করতে শিখেছিল বিশুদ্ধ তামা। পরে তারা লোহাপাথর থেকে লোহা তৈরিও শিখেছিল। বনজ সম্পদের সঙ্গে বহিরাগত বণিকগণ হাতে পেয়ে গেলেন তামা ও লোহার মতো উৎকৃষ্ট পণ্য। তামা ও লৌহ উৎপাদনকারিদের উৎসাহ জুগিয়ে সেই বণিকগণ ধাতু উৎপাদন বহু গুণে বাড়িয়ে ফেললেন। শুরু করলেন ধাতুর বাণিজ্য। নদীপথে চলত সেই বাণিজ্য। আমার বুকে বড় নৌকা চলতে পারত না। ছোট ছোট নৌকায় পণ্য নিয়ে আমার স্রোত বেয়ে পড়ত সুবর্ণরেখায়। সেখানে নোঙর করা বড় নৌকায় পণ্য বোঝাই করত। তারপর বঙ্গোপসাগরের পথ বেয়ে সে পণ্য পৌঁছে যেত দেশবিদেশের নানা জায়গায়।

এই বণিকগণ ছিলেন শিক্ষাদীক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিতে আমার কূলবাসীর তুলনায় অনেক এগিয়ে। এঁরা অহিংস জৈনধর্মের মানুষ। যে দিগম্বর দীর্ঘাঙ্গী মহাপুরুষের কথা বলেছিলাম তিনি জৈনধর্মের চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মধ্যে শেষতম তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীর। জৈনধর্মের প্রধান প্রচারক। ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে মহাবীরের অনুগামী জৈনরা পরম নিষ্ঠায় নিজেদের জৈনধর্ম অনুশীলন করতেন। ধর্মচর্চার জন্য তাঁরা আমার কূলে গড়ে তুলেছিলেন বেশ কয়েকটি দেউল। আমার অববাহিকায় মাকড়াপাথর সহজলভ্য। তাই দেউলগুলি ছিল মাকড়াপাথরের তৈরি। দেউল মধ্যে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আরাধ্য তীর্থঙ্করমূর্তি। দেউলের কুলুঙ্গিতে স্থাপন করেছিলেন তীর্থঙ্করদের পার্শ্বদেবতা যক্ষ-যক্ষিণীর মূর্তি।

আজ থেকে প্রায় দেড়-দু হাজার বছর আগে প্রতিষ্ঠিত জৈনদের সেই দেউল এবং মূর্তির অবশেষ এখনও রয়েছে আমার পাড়ে। রাজপাড়া, পড়িহাটি, নুনিয়া বা রোহিণীতে গেলে সে সব দেখতে পাবে। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সারা রাঢ়বাঙলার ছিল জৈনধর্মের অনুশীলন। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে রাঢ় অঞ্চলের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে

এবং ব্যবসাবাণিজ্যের পরিবেশের অবনতি ঘটায় জৈন বণিকগণ এই এলাকা ছেড়ে চলে যান। স্থান ত্যাগ করার সময় তাঁরা নিজেদের ইষ্টদেবতার মূর্তি নদী বা আশপাশের জলাশয়ে বিসর্জন দিয়ে যান। জৈনদের স্থানত্যাগের বহু বছর পর নতুন নতুন বাসিন্দারা এসে আমার কূলে বসবাস শুরু করে। তারাই আমার জল থেকে বা অন্য জলাশয় থেকে কিছু মূর্তি খুঁজে পায় এবং জৈনমূর্তি সম্বন্ধে ধারণা না থাকায় তাঁরা তীর্থঙ্কর ও অন্যান্য জৈন দেবদেবীর মূর্তিকে নিজেদের দেবতা জ্ঞানে পুজো করতে শুরু করে।

রাজপাড়া খাদিবোর্ড মাঠে পড়ে রয়েছে কালো গ্রানাইটপাথরে খোদিত একটি পার্শ্বনাথ মূর্তি। মূর্তির এদিক ওদিকে মাকড়াপাথরের বেশ কিছু ফলক পড়ে রয়েছে। আর রয়েছে পঁচিশ-ছাব্বিশটি দেউলাকৃতি স্তম্ভ। মূর্তিটিকে গ্রামবাসীরা বিষ্ণুঠাকুর রূপে পুজো করেন। পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন গ্রামের লোধা-শবর সম্প্রদায়ের মানুষ সুবল শবর। যে পাথরের ফলকগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সেগুলি আসলে জৈন দেউলের অবশেষ। দেউলাকৃতি যে স্তম্ভগুলি মাঠে পোঁতা রয়েছে সেগুলি হল নিবেদন দেউল। জৈনরা তাঁদের দেবতার উদ্দেশ্যে এই নিবেদন দেউল প্রদান করত। মৃতদেহ দাহ শেষে নিকটাত্মীয়ের দেহাবশেষ নতুন কলসে রেখে তার ওপর সরা চাপা দিয়ে কলসটি তিন-চার হাত মাটির নিচে পুঁতে দিয়ে তার ওপর একটি করে দেউলাকৃতি নিবেদন দেউল তাঁরা বসিয়ে দিতেন।

আমার এক ছোট উপনদী বাঁশির খাল রাজপাড়া ঘেঁসে প্রবাহিত হয়েছে। সেই খাল দিয়ে জৈন ব্যবসায়ীরা পণ্য পরিবহন করত। মালপত্র বলদের পিঠে ছালায় ভরে ঘাটে নিয়ে আসা হত। রাজপাড়াতে ছিল তাদের বাণিজ্যঘাঁটি। এখানে তারা পার্শ্বনাথের দেউল গড়ে তুলেছিল। এখন তো আমি শুকনোপারা। সে সময় ছিল আমার ভরা যৌবন। কত জল বয়ে যেত আমার বুক দিয়ে। বর্ষায় টইটুম্বুর হয়ে ফুলেফেঁপে থাকতাম। কত বড় বড় নৌকা ভিড়ত আমার ঘাটে। সে সব মনে পড়লে এখন কান্না পায়।

আমার পাড়ে পড়িহাটিতে ছিল আর এক জৈন দেউল। ঋষভনাথের। সেটিও ধ্বংস হয়ে গেছে। গ্রামের সাতশকড়া পুকুড়ের পাড়ে ছিল সেই দেউল। সেখানে এখনও দেউলের কিছু ফলক পড়ে রয়েছে। ঋষভনাথের ভগ্ন মূর্তি উদ্ধার করে গ্রামের ভেতর রক্ষিণী মন্দিরের সামনে রাখা হয়েছে। প্রায় তিন ফুট উচ্চতার ভগ্ন মূর্তির পাদবেদিতে খোদিত প্রস্ফুটিত পদ্ম, তার নিচে বৃষ এবং বৃষের উভয় পার্শ্বে সিংহ। পায়ের দুধারে চামর হাতে দণ্ডায়মান সেবাদাস। মন্দিরে যে রক্ষিণী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত সেটিও বিরল। ভীষণদর্শনা অষ্টভুজা ওপরের দুটি হাত দিয়ে মাথার ওপর একটি হাতি তুলে ধরে রেখেছেন। এই রক্ষিণী সম্ভবত ছিলেন এক জৈন যক্ষিণী। হয়তো ঋষভনাথের দেউলের কোন অংশে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

আমার ডান পাড়ে নুনিয়াতেও ছিল এক জৈন দেউল। সেখানেও রয়েছে মাকড়াপাথরের নিবেদন শিলা, বরাহ ও হস্তীর মূর্তি। প্রাচীন জৈন দেউল ভেঙে সেই মন্দিরের পাথরের চাঁই ব্যবহার করে তারই ওপর গড়ে তোলা হয়েছে বর্তমানের জগন্নাথ মন্দির। যে ভগ্ন দিগম্বরমূর্তি দেউলের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গিয়েছিল সেটি কলকাতার জাদুঘরে রাখা আছে। নুনিয়া-পড়িহাটি অঞ্চলে আজ থেকে প্রায় এক-দেড় হাজার বছর পূর্বে রাজত্ব করতেন ডোম সম্প্রদায়ের সেন পদবিধারী রাজারা। তাঁদের ইতিহাস বলার মতো আজ আর কাউকে পাওয়া যাবেনা। তাঁদের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। কেবল পড়িহাটিতে কালু বীরের থানটিই কালু সেন রাজার অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলে এসেছেন পণ্ডা জমিদার। শেষে পানীরা জমিদারি লাভ করেন। নুনিয়ার জমিদার নুনের ব্যবসা করতেন। তার থেকে গ্রামের নাম হয়েছে নুনিয়া।

স্রোত ধরে এগিয়ে পৌঁছনো যাবে চিল্কিগড়ের রাজপ্রাসাদে। ডানপাড়ে ধবলদেব রাজাদের প্রাসাদ। ধবলদেবরা আদতে ধলভূমগড়ের রাজা। মাতুলবাড়ির সম্পত্তি পেয়ে চিল্কিগড়েও তাঁরা রাজত্ব কায়েম করেছেন। বামপাড়ে যেখানে এখন কনকদুর্গা মন্দির সেখানে গড়ে উঠেছিল ত্রিপাঠি রাজার গড়। পুরীর রাজা প্রতাপ রুদ্রদেবের কাছ থেকে বলভদ্র ত্রিপাঠী এই রাজত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁরা পাথরের ভিতের ওপর ইটের তৈরি জগন্নাথ মন্দির গড়েছিলেন। তার ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে কনকদুর্গা মন্দিরের ডানদিকে। ত্রিপাঠিবংশের তৃতীয় রাজা বিশ্বরূপ ত্রিপাঠিকে তাঁর সেনাপতি বিরাম সিংহমত্তগজ ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেন। স্নান করার আগে ঘাটের যে পাথরে বসে রাজা প্রতিদিন তৈল মর্দন করতেন সেই পাথর চাপা দিয়ে রাজাকে খুন করেছিলেন সেনাপতি। আর সেই পাথরে মাথা ঠুকে রাজার সঙ্গে সহমরণে গিয়েছিলেন রানি মহামায়া। ঘাটে সে পাথর এখনও রয়েছে। সেটিকে বলা হয় পঁড়াপাথর। ধূপধুনো দিয়ে আজও সে পাথরের পুজো হয়। কনকদুর্গা মন্দিরে এলে দেখে যেও সেই অভিশপ্ত পঁড়াপাথর। চিল্কিগড় ছাড়িয়ে আর একটু এগোলে পাবে সতীঘাটা। এখানেই সতীদাহ হয়েছিল। রানি মহামায়া সতী হয়েছিলেন না জোর করে তাঁকে স্বামীর চিতায় তুলে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছিল সে শুধু আমিই জানি।

সতীঘাটা ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে পেয়েছি মিষ্টি মেয়ে পলপলাকে। ডানদিক থেকে এসে ও আমার সঙ্গে মিশেছে। আর বামদিক থেকে এসে মিশেছে কুৎরঙ্গ। চলার পথে বামদিকে চন্দ্রী গ্রামে রয়েছেন চন্দ্রশেখর শিবঠাকুর। চৈত্রগাজনে নীলের পূর্বরাত্রে পেতলের কলসিতে আমার জল ভরে ভারে ভারে নিয়ে গিয়ে সূর্যোদয়ের ঠিক আগে বাবা চন্দ্রশেখরকে পুণ্যস্নান করানো হয়। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় গরিয়াভার। ঢাকঢোল কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে ঘটা করে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। লালপাড় সাদাশাড়ি পরে গ্রামের

মেয়েরা আমার পাড়ে জড়ো হয়। কী ভালো যে লাগে ! আজ থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগে এই চন্দ্রী গ্রামে দিলীপ দাসের উঠোনের পুরনো তেঁতুলগাছের গোড়া থেকে পাওয়া গিয়েছিল এক ঘড়া তামার মুদ্রা। মুদ্রা বিশেষজ্ঞরা বলেন এগুলো কণিষ্কের আমলের। হবেও বা। কত বছরের কথা ! আমার স্রোত ধরে হাজার হাজার বছর ধরে কত বিদেশীর আনাগোনা। কত আর মনে রাখা যায় ! চন্দ্রীর পরের গ্রাম যুগীডিহা। ঐ গ্রামে আমার ডানপাড়ে অনেক যুগ আগে একটা মন্দির ছিল। কয়েক টুকরো পাথর ছাড়া সে মন্দিরের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। তবে ওখানে অশ্বত্থতলায় অব্রাহ্মণ বা দেহরি পূজিত যুগিয়াবুড়ির থানে যে প্রস্তরমূর্তির ভগ্ন অবশেষ রয়েছে সেই সূত্র ধরে ঐ মন্দিরের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

বেশ চলছিলাম জঙ্গল ফুঁড়ে শাল জঙ্গলের ছায়ায় ছায়ায়। ফেকোঘাটের কাছে আমার ওপর একদিন তৈরি হল পাকা সেতু। দিন নেই রাত নেই গোঁ গোঁ শব্দ তুলে দৌড়চ্ছে হাজার হাজার গাড়ি। ওটা যে মুম্বাই রোড। ফেকোঘাটে আমার বালি তুলে বিক্রি করে কত মানুষ লাল হয়ে গেল। কলকাতা পর্যন্ত আমার বালির কদর। লোকে আদর করে বলে ফেকোর বালি।

পেরিয়ে গেলাম বেলিয়াবেড়া প্রহরাজ জমিদারদের প্রাসাদ। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ ছিলেন পণ্ডিত মানুষ, গুণী মানুষ। আরও এগিয়ে বেষ্টন করেছি বাঘেশ্বর শিবের পদযুগল। বাবার পদধৌত করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছি। বামদিকে আবার এক বিস্মৃত রাজার গড়। গড়ের ধ্বংসস্তূপ এখন মাটির নিচে। পঞ্চদশ শতকে পুরীর রাজা কপিলেন্দ্র দেবের বিতাড়িত পুত্র বলীবন্ত ভাগ্যান্বষণে বেরিয়ে আমার পাড়ে এখানেই তাঁর রাজ্য গড়ে তোলেন। পরে তিনিই ঝাড়গ্রামের তৎকালীন জঙ্গলসর্দারকে পরাজিত করে ঝাড়গ্রাম দখল করেন এবং ঝাড়গ্রামে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁরই সুযোগ্য পুত্র সর্বেশ্বর সিংহ। গড়বালিপালে রাজা বলীবন্তের ইষ্টদেবী কেঁদুয়া মাতা আজও সাড়ম্বরে পূজিত হন। অনাবৃষ্টি দেখা দিলে গ্রামের মানুষ আমার জল ভারে ভারে নিয়ে গিয়ে মা কেঁদুয়ার কুণ্ড পুর্ণ করেন। তারপর আসে ঝেপে বৃষ্টি।

আরও এগিয়ে বামপাড়ে বনপুরা গ্রামে রয়েছে সাতভউনী থান। রাজা রণজিৎ কিশোরের সাত পত্নী ছিলেন সাত বোনের মতো। একদিন কালাপাহাড়ের আক্রমণে রাজা প্রাণ হারালেন। শত্রুর হাত থেকে মান বাঁচাতে সাত রানি ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন আমার জলে। সেই আত্মবিসর্জনকারী সাতরানিই একত্রে প্রস্তর মূর্তি ধারণ করে বিশালাকার চন্দ্রাবতী লতার বিটপি তলে পুজো পাচ্ছেন সাতভউনী থানে।

এরপর জমজমাট রোহিণী গঞ্জ। রোহিণী প্রবেশের মুখে বামপাড়ে রয়েছে ভ্রমরগড়। সে এক ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী। বরোজীয়া কন্যা দীর্ঘকেশী রূপবতী ভ্রমর চুল আঁচড়ে চুলের গোলা শালপাতায় জড়িয়ে আমার জলে ছুড়ে দিত। আমি সে চুল ভাসিয়ে নিয়ে যেতাম সুবর্ণরেখার দিকে। একদিন প্রকৃতিপ্রেমী রাজপুত্রের হাতে পড়ল শালপাতায় মোড়া সে দীর্ঘকেশের গোলা।

রাজপুত্র ভাবেন, যাঁর চুল এত দীর্ঘ তিনি দেখতে কত না সুন্দরী! সুন্দরীর খোঁজে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন রাজপুত্র। শ্যামলবরণ ভ্রমর তখন বরোজটিবিতে পান বরোজে কলসি করে জল দিচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে প্রেমে পড়ে গেলেন রাজপুত্র। রানি করবেন তাঁকে। কিন্তু ভ্রমরের বাবার না পসন্দ ভিনজাতির বরকে। হোক না সে রাজপুত্র। রাজপুত্রের রোখ। সে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে ভ্রমরকে। লড়াই লেগে গেল। ভ্রমর বাবার সম্মান রক্ষায় আমার জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। বুক ভরা ব্যথা নিয়ে রাজপুত্র ফিরে গেলেন। প্রিয়া ভ্রমরের স্মৃতিতে তিনি বানিয়ে ফেললেন নতুন প্রাসাদ 'ভ্রমরগড়'।

এই রোহিণীতে জমিদার অচ্যুত পট্টনায়কদের সন্তান হিসেবে জন্মেছিলেন রসিকমঙ্গলের নায়ক বৈষ্ণব চূড়ামণি রসিকানন্দ মহাপ্রভু। বালক রসিকমুরারী অন্য বালকের সঙ্গে আমার পাড়েই খেলা করত। এখন তাঁর জন্মস্থানে গড়ে উঠেছে কৃষ্ণমন্দির। সুবর্ণরেখা দিদির কোলে ঝাঁপ দেওয়ার ঠিক আগে রোহিণী গ্রামে আমার বামপাড়ে ছিল এক জৈন দেউল। হাজার-দেড় হাজার বছর আগে পরিত্যক্ত সে দেউলের ধ্বংসস্তূপের ঢিবির মাথায় বট-কুচলার জঙ্গলের মধ্যে ছোট ছোট দুটি মূর্তিকে ভৈরব হিসেবে পুজো করা হয়। যেগুলি একসময় ছিল জৈন দেবতার মূর্তি।

এই রে গল্প বলতে বলতে টুসু-ঝুমুরের কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। টুসু-ঝুমুরের গানই তো আমার প্রাণের গান। মকরের দিন আমার ঘাটে ঘাটে হলুদ লাল শাড়ি পরে মেয়েরা তাদের আদরের টুসুমণিকে ভাসান দেয়। গানে গানে মুখরিত করে তোলে আমার চরাচর। আমি কান পেতে শুনি তাদের সহজসরল জীবনের গান। আমিও তখন আমার প্রিয় কবিপুত্রের সুরে কলকল রবে সুর মিলিয়ে বলি-

টুসুমণি আল্লাদিনী দেশের দুখে মন কাঁদে
আউল্যা চুল তার বিনাঞ দেগো
ম্যায়সর মাঁসের আবাদে (টুসুগীত-ভবতোষ শতপথী)

ঝুমুর গানের জবাব নেই। কত কবি যে কত ঝুমুরগান বেঁধেছেন কত শিল্পী যে সে সব গান তাঁদের মরমী কণ্ঠে গেয়েছেন তার লেখাজোখা নেই। আমাকে নিয়ে কী আবেগ ভরা গান বেঁধেছেন আমার আর এক গীতিকার পুত্র। এসো সে গানের দু-এক কলি তোমাদের শোনাই-

ডুলুং বাঁচায় হামাদেরই পরান
ডুলুং হামদের মায়েরই সমান।
গিধনী চিলকি জামবনী
তারই জলে সোনার খনি।
ঝাড়গাঁয়ে ফলায় সোনার ধান
ডুলুং হামদের মায়েরই সমান। (ঝুমুরগীতি -ললিতমোহন মাহাত)

এবার আমি সুবর্ণরেখায় মিলিয়ে যাব। মিলিয়ে যাব কিন্তু হারিয়ে যাব না। মহুল-কুরুচির গন্ধ নিয়ে টুসু-ঝুমুরের ছন্দ নিয়ে ধামসা মাদলের বোলে মাতোয়ারা হয়ে থাকব। আর চলতে চলতে তোমাদের গল্প শুনিয়ে যাব।

রুমা আঢ্য, সংস্কৃত বিভাগ, চতুর্থ সেমেস্টার

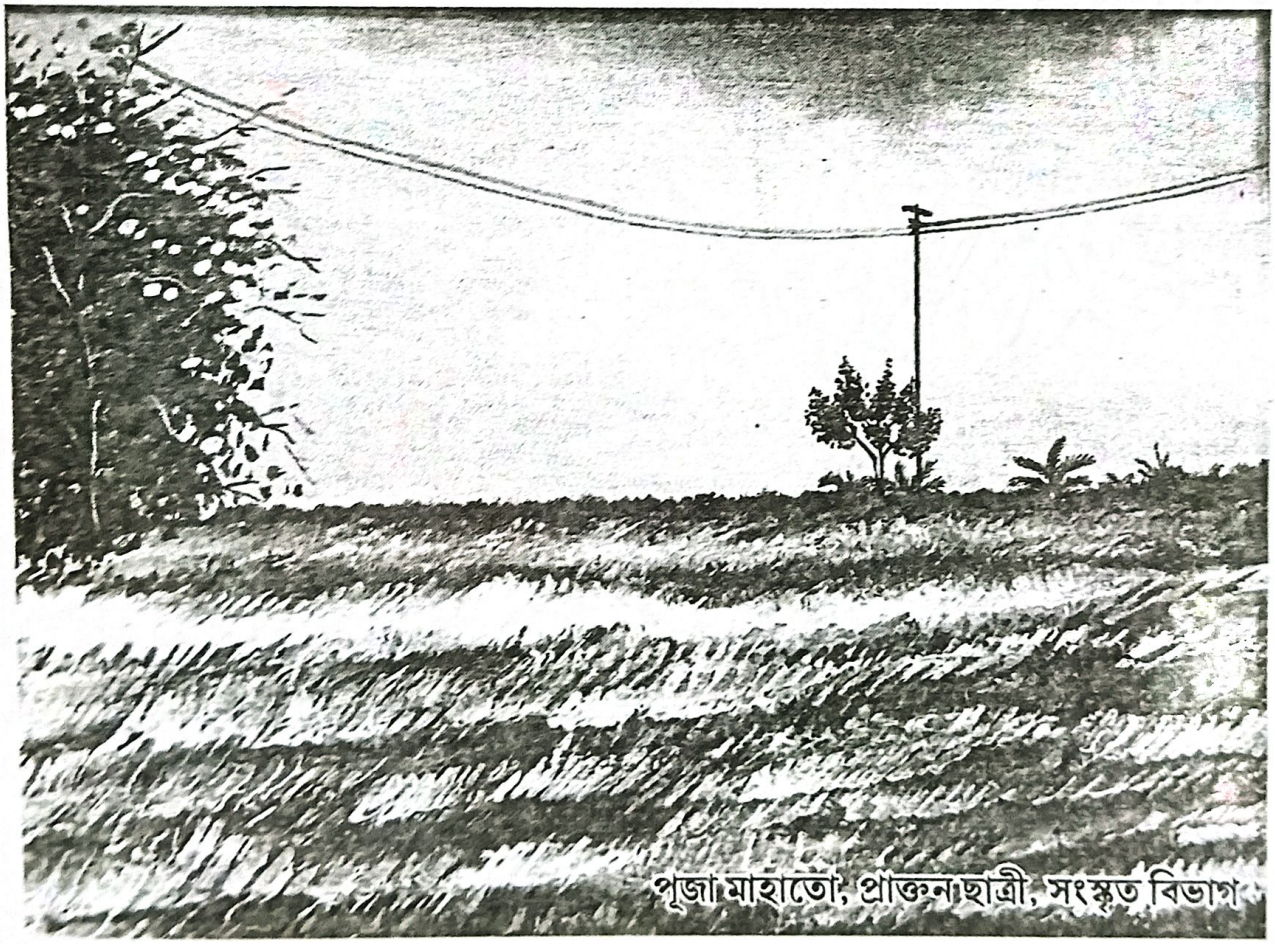

পূজা মাহাতো, প্রাক্তন ছাত্রী, সংস্কৃত বিভাগ

স্বস্তিকা মুখার্জী, ইংরেজি বিভাগ, চতুর্থ সেমেস্টার

প্রেরণা কর
বাংলা বিভাগ, ষষ্ঠ সেমেস্টার

মধুরিমা শীট
বাংলা বিভাগ, ষষ্ঠ সেমেষ্টার

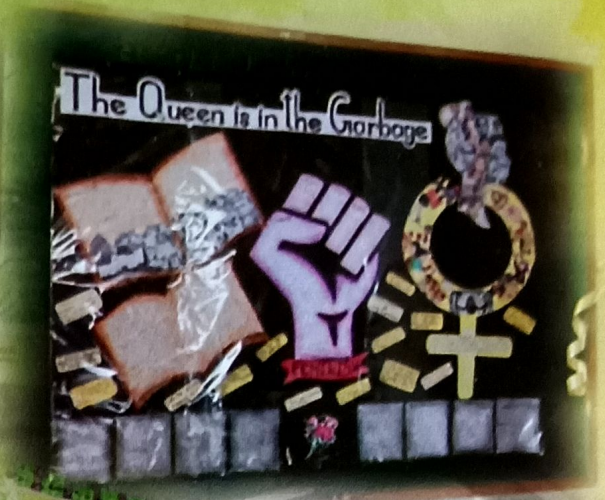

Children's Health Camp

Chunikotal Pathshala

Date: 2nd October, 2022

Time: 4 - 5 p.m.